সোপান।

প্রথম স্তর।

(নীতি-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।

" I call that mind free which sets no bounds to its love, which is not imprisoned in itself or in a sect, which recognizes in all human beings the image of God and the rights of his children, which delights in virtue and sympathizes with suffering wherever they are seen, which conquers pride, anger, and sloth, and offers itself up a willing victim to the cause of mankind."

"Without God our existence has no support, our life no aim, our improvements no permanence, our best labours no sure and enduring results, our spiritual weakness no power to lean upon and our noblest aspirations and desires no pledge of being realized in a better state."

W. E. channing. D. D.

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, অবনী প্রেসে, শ্রীমোহিনীমোহন হড় দ্বারা মুদ্রিত,

এবং ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩০০।

উৎসর্গ।

পরম প্রীতির আস্পদ—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধেয়া ভগ্নি,

আপনি আমার যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষমা হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার আমার আর কোন উপায় নাই। আপনার মানসিক সৌন্দর্য্যের নিকট আমি আত্ম বিক্রয় করিয়াছি। আপনার প্রতিভা, আপনার প্রখর বুদ্ধি, আপনার সুতীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তি, আপনার জ্ঞান ও শিক্ষা, আপনার অহঙ্কার-শূন্য আত্মাকে এই খলতাময় সংসারে এক অপরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। আমাদিগের দেশের যে সকল মহিলাগণ এইক্ষণ শিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ২ সংসারের পূতিগন্ধযুক্ত অহঙ্কারের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। সেই সকল মহিলাগণের আচরণে আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকি; কিন্তু যখন আপনার বিনয়াবনত ও শান্ত মূর্ত্তি স্মরণ পড়ে, তখন এদেশকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। এই বঙ্গদেশের রমণীগণের মধ্যে আপনাকে সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রচনা বলিয়া বুঝিয়াছি। সংসার আপনাকে জানুক বা না জানুক, আপনার অস্তিত্বে এদেশের গৌরব শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এই বলিতে পারি;—আমি আপনার হৃদয়কে ভালবাসি,—আপনার প্রতিভাকে পূজা করি, আপনার বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির সম্মান করি;—আর আপনার পবিত্র চরিত্রকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। কিন্তু এ সকল প্রকাশ করিবার আর কোন উপায় নাই;—আমি দরিদ্র,—মূর্খ,—জ্ঞানহীন;—বুদ্ধিহীন। পৃথিবীতে যে ধনের কাঙ্গাল আমি;—সে ধন আমার মিলিল

না ;—ঈশ্বরকে জানিলাম না ;—ধর্ম্ম বুঝিলাম না,—চরিত্র পাই লাম না। আর কি বলিব ;—যাহা আমার শিক্ষা করা উচিত ছিল,—এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাহার কিছুই হইল না ; অগাধ শিক্ষাসমুদ্রে ডুবিয়া কুল কিনারা কিছুই পাই না। ভগ্নি, সম-দুঃখিনী আপনি ; তাই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার উপহার কেবল অভাব-প্রকাশক মাত্র, কিন্তু হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি-প্রকাশের উরযুক্ত নহে। কি করিব, ইহাই গ্রহণ করুন। "সোপান" প্রথম স্তর আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা, পটোলডাঙ্গা
কার্ত্তিক, ১২৮৬।

আপনার স্নেহ-প্রার্থী
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

নিবেদন।

সোপান—প্রথম স্তর প্রকাশিত হইল, ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই ইতিপূর্ব্বে 'ভারত-সুহৃদ্' ও 'সমালোচক' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; সেই সকল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ইহাকে জনসাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম।

সোপান মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে দুইটী চিন্তা আমাদের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল। প্রথম চিন্তা এই,—রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিকে কেন আমরা এক স্থানে দেখিতে পাই না। অনেকে বলিয়া গিয়াছেন, ইহা চিরকাল বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, চিরকাল থাকিবে ; আমরা কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি,—ভারতে এই তিনটীর মিলনে যে বল সৃজিত হইবে, তাহাই এদেশের ভাবী উন্নতির মূলভিত্তি স্বরূপ হইবে। সোপানে, তজ্জন্য, আমরা নীতি সম্বন্ধে কোন তারতম্য রাখিলাম না ;—ইহাতে যথাসাধ্য রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সমাবেশ করিয়াছি। দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় এই ;—আমাদিগের এ উদ্যম কি ফল প্রসব করিবে? অর্থাৎ এদেশের লোক কি একই সময়ে এই ত্রিবিধ নীতির আদর করিতে পারিবে? ইহা ভাবিয়া আমরা কূল পাইলাম না,—কিন্তু তথাপি বিড়ম্বনার জাল বিস্তৃত করিলাম!! যদি ইহাতে ভাল ফল হয়, দেশের প্রতি আমাদের আশা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

সোপান সম্বন্ধে পাঠকগণের নিকট আমাদের এইটী অনুরোধ—ইহা পাঠ করিবার সময় মনে রাখিবেন, ইহাতে কেবল ব্যক্তিবিশেষের মত। আমরা সর্ব্বসাধারণের মত রক্ষা করিতে চেষ্টা পাই নাই। আমাদের মতের সহিত যতদূর ঐক্য হইবে, ততটুক গ্রহণ করিবেন, অন্য অংশ পরিত্যাগ করিবেন। আমাদিগের মতে ভ্রম থাকিতে পারে না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না ; আমাদিগের মত সম্বন্ধে যদি কেহ ভ্রম প্রদর্শন করেন, বিনীত মস্তকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

আমরা প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে কাহারও সমকক্ষ হইতে ইচ্ছান্বিত হই নাই। আমরা কল্পনা অপেক্ষা কার্য্যের অধিক পক্ষপাতী ;—আমরা প্রকৃত চরিত্রবান জীবনের অধিক পক্ষপাতী। ভাল কথা শুনি বা না শুনি, বলি বা না বলি, ভাল জীবন দেখিতে পাইলে আমরা কৃতার্থ হই। এদেশে যদি কিছুর অভাব থাকে, তবে তাহা চরিত্রবান লোকের। এ দেশের যে প্রকার দুরবস্থা, চরিত্র সম্বন্ধে সকলকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে। প্রকৃত চরিত্রের নিকট চিরকাল আমরা অবনত-মস্তক। সোপান যদি একটী জীবনকেও প্রস্তুত করিতে পারে, আমাদিগের বাসনা পূর্ণ হইবে ; পরিশ্রম সার্থক হইবে।

সূচীপত্র।

অশুদ্ধি শোধন।

৭২ পৃষ্ঠা—১১ পংক্তিতে—"উপযুক্ত রূপ সার না দিয়া" স্থলে "উপযুক্ত রূপ সার দিয়া" পড়িতে হইবে।

সোপান

(নীতি বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ)

প্রকৃতির সুন্দর ছবি এবং মানবের স্বার্থ।

এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সংসারে মানব সুন্দর পদার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানেই ভালবাসা, সেইখানেই মনাকর্ষণ, সেইখানেই আত্মবিসর্জ্জন জগতের স্বাভাবিক ঘটনা এবং যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানেই প্রতিগ্রহণের ইচ্ছা, সেইখানেই আসক্তি এবং সেইখানেই স্বার্থ। স্বার্থ, মানব হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের ধন, কিন্তু ইহা অতি ঘৃণিত বৃত্তি। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত মানব হৃদয়ের যে স্বার্থের সম্বন্ধ, তাহাও অত্যন্ত ঘৃণিত; এ বিষয়ে মত বৈষম্য থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে সুন্দর পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিতে পারে না, কারণ রুচি ও শিক্ষার তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন মানবের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক্ কথা, যাঁহার নিকট যে পদার্থ সুন্দর, সেই পদার্থেই তাঁহার মন আকৃষ্ট, এবং সেই পদার্থেই তাঁহার হৃদয় আসক্ত। এ সকল প্রকৃতির রোগগ্রস্ত আত্মার অস্বাভাবিক ফল কি না, তাহা আমরা বিচার করিতে ইচ্ছুক নহি; কিন্তু সংসারের সৌন্দর্য্যের সহিত মানবের স্বার্থের ঘৃণিত সম্বন্ধ দেখিয়া আমরা বড়ই কাতর হইয়াছি। প্রস্ফুটিত সুগন্ধযুক্ত কুসুমের ঘ্রাণে জগৎ মোহিত, ইহা স্বাভাবিক ক্রিয়া, স্রষ্টার অলৌকিক মহত্ব বিস্তারের চিত্র; কিন্তু ঐ কুসুমকে হস্ত-পেষিত হইতে দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়; এ স্থলে নিশ্চয় বলিব, স্বার্থের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘৃণিত। ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া যায় বলিয়া মানবের তাহা স্পর্শ এবং পেষিত করিবার অধিকার কি, আমরা জানি না। সুন্দর পদার্থ দেখিলে মন মোহিত হইয়া স্রষ্টার প্রতি অনুরক্ত হইবে, ইহা ভিন্ন আর সৌন্দর্য্যময় সৃষ্ট বস্তুর অন্য আবশ্যকতা কি? কি হইতে পারে? সুগভীর

রজনীতে সুস্নিগ্ধ চন্দ্র-রশ্মিতে যাহারা নিবিষ্ট মনে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই অনুভব করিতে পারেন যে, সুন্দর পদার্থের সহিত মানবের স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যে, জগতে এ প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্বাভাবিক। আমরা চিরকাল বলিব যে,—ইন্দ্রিয়ের সহিত রিপুর সম্বন্ধ, মানবের শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই এত ঘৃণিত আকার ধারণ করিয়া, সংসারকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বসন্ত কালে কোকিলের স্বর শুনিয়া, মলয়ানিল সেবন করিয়া, কিম্বা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বিচরণ করিয়া, সুগন্ধযুক্ত পুষ্পের ঘ্রাণ লইয়া যাহারা রিপুর উত্তেজিত অবস্থা অনুভব করিয়া থাকেন, আমরা বলি, তাঁহারা নিশ্চয় বিষম রোগগ্রস্ত। ক্ষুধা পাইলে আহার করা উচিত, না সুন্দর খাদ্য সামগ্রী দেখিলেই তাহা আহার করা উচিত, যাঁহারা চিন্তা করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন, তাঁহারাই আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন। ক্ষুধা নাই, মেঠাই-ওয়ালা দ্বারে আসিয়া সুমিষ্ট আহারের দ্রব্য দেখাইল, অমনি রসনায় জল আসিল, আহারে রুচি হইল এবং মানুষ আহার করিয়া, সৌন্দর্য্যের সৎব্যবহার করিল। ইহা যে প্রকৃতি বিকৃতির ফল, সন্দেহ নাই। সংসারের মানব-প্রকৃতিই বিষম রোগগ্রস্ত; এ জন্যই মানব সুন্দর পদার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেখানে পবিত্র ভাবের আবির্ভাবের পরিবর্ত্তে এখন স্বার্থের ভাব আসিয়া সম্বন্ধকে অত্যন্ত জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সংসারের এই প্রকার দুর্গতি দেখিয়া বিষণ্ণ ভাবে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যেদিন সৌন্দর্য্যের সহিত মানবের স্বার্থের এরূপ সম্বন্ধ চলিয়া যাইবে, যে দিন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যেই মানব ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইবেন। ঈশ্বরই জানেন, সে সুখের অধিকারী আমরা কতদিনে হইব!!

প্রকৃত বীরত্ব।

যদি এই দুর্ব্বল, চিরনিদ্রাপ্রিয়, নির্জীব ভারতবর্ষীয়গণের হৃদয়ের এক-কোণে উৎসাহের শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এখনই তাঁহাদিগের ভাবী কর্ত্তব্যের পাদ-চারণার পথ নির্ণয় করিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা জানি না, মন্ত্র পরিগ্রহণের সময় ভারতবর্ষে

উপস্থিত হইয়াছে কি না; সংকল্প গ্রহণ করত অন্তরে সংযম ব্রত দ্বারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার সময় ভারতে আসিয়াছে কি না, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। চতুর্দ্দিকে যে প্রকার প্রবৃত্তির স্রোত বহিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে এই প্রবাহ হইতে রত্ন প্রসূত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে কি না, তাহাও আমরা জানি না। না জানিলেও, আমাদের অন্তরে অনেক আশার স্বপ্ন বিরাজ করিতেছে। আমাদের সে সকল স্বপ্ন যে কাল্পনিক মৃগতৃষ্ণিকায় প্রবঞ্চিত মরুভূমে নিপতিত পথিকের ন্যায় আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না, তাহাও আমরা বলি না। আমাদের আশার মূলে কল্পনা আছে, স্মৃতি আছে, পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে, এ সকল সত্বেও যখন আমারা মনুষ্য বলিয়া জগতে পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতেছি, তখন আমাদের আশার মূলে যে কিছুই সত্য নাই, তাহাও কেহ বুঝাইতে পারিবেন না। আমরা বলি, পূর্ব্বে যে বায়ু ভারতকে কেবল শীতল করিয়া বহিয়া যাইত, এখন সে বায়ু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; যে রূপেই হউক্, পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের বায়ুকে কতক পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। স্বার্থসিদ্ধির উপায় আবিষ্কার করিতে যাইয়া ইংরাজেরা ভুলভ্রমে ভারতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এ কথা বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে চাও, হও, আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ভারতের পূর্ব্বের কুসংস্কারময় বায়ু এখন আর নাই। দুর্ভিক্ষ-পীড়নে ভারতের অস্থিমজ্জা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক্ কথা; অন্নাভাবে কোটি কোটি লোক মরিয়া যাইতেছে, তাহাও ঠিক্; কিন্তু ঐ মৃত্যু মৃত্যু নহে, উহাতে ভাবী জীবনের অঙ্কুর আছে। ভারতের একপ্রাণতার বায়ু এখন এত প্রবল হইয়াছে যে, এক-জনের মৃত্যু আর এক জনের জীবনে দ্বিগুণ জীবন সঞ্চার করে। ভারতের এই অবস্থা যদি আমরা না দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে এত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আর এ কষ্টের জীবনতরী বাহিতাম না; এই সকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া যদি আমাদের হৃদয় উৎসাহিত ও বলযুক্ত না হইত, নিশ্চয় বলিতেছি, এত-দিন এ প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিত। আমাদের অন্তরে আশা আছে, তাই আমরা আজও আছি, অন্তরের গরল অন্তরে পোষণ করিয়াও দিনের পর দিন, অবিচলিত ভাবে, বিদায় করিয়া দিতেছি।

দেখা যাউক্, বাস্তবিক প্রকৃত বীরত্ব কি, এবং বীরত্বের আবশ্যকতা ভারতে আছে কি না। এ জগতে এমন দিন ছিল, যখন যোদ্ধা ভিন্ন আর কেহই

বীরপদে অভিহিত হইতে পারিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপ ব্যাপিয়া মহা কোলাহল ধ্বনি উঠিয়াছিল, যখন সকল দেশ দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়নের বাহু বলের নিকট মস্তক অবনত করিতেছিল, তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম,—নেপোলিয়নই প্রকৃত বীর। আমাদের দেশের পুরাকালে যাঁহারা বীর পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বাহুবলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বাহুবলই বীরের লক্ষণ, একথা জগতে এত বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলাও অসম্ভব। আমরা বলি, বাহু বলে যে বীরত্ব, তাহা অতি নীচ শ্রেণীর বীরত্ব; একাল পর্য্যন্ত একথা জগতে প্রচারিত হইয়া না থাকিলেও, এমন সময় আগমন করিবে, যখন আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। বাহুবল পৃথিবীর অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর বল, ধনবল অপেক্ষাও হেয়। সত্য বটে, আজ পর্য্যন্তও এই বাহু-বলের নিকট দুর্ব্বল-মস্তক নত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা বলি, সে দুর্ব্বলতা শরীরের নহে, মনের। আমরা বলি, নির্জ্জীব শরীরেও মানব বীর হইতে পারে, যদি তাঁহার অন্তরে ধর্ম্ম ভাব থাকে, যদি সত্যের আদর, ন্যায়ের আদর, ও নীতির আদর তাঁহাকে উজ্জ্বল করে, অর্থাৎ যদি সে প্রকৃত চরিত্রবান্ ব্যক্তি হয়। এ সংসারে সে-ই প্রকৃত বীর, যে শত সহস্র নির্য্যাতনেও সত্য পথ পরিত্যাগ করে না; সে-ই প্রকৃত বীর, যে জীবন পরিত্যাগ করিয়াও বিবেকানুমোদিত স্ব-মত বজায় রাখিতে সক্ষম, অথবা যে ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে সদা জয়ী;—পাপ প্রলোভনে যে আকৃষ্ট নহে। ভারতবর্ষে যদি যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আমরা সেই প্রকার বীরের উত্থান দেখিতে চাই, যে আপন সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পাশব বল প্রয়োগে যাহা হয়, তাহা পৃথিবীতে অনেক দেখিয়াছি। দেখিয়াছি—পাশব বলের নিকট চিরকাল দুর্ব্বল মানব নিপীড়িত হইয়া চরণে মর্দ্দিত হয়। ভারতে কি আবার সেই জয় প্রার্থনীয়, যাহাতে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার অপ্রতিহত রহিবে? ভারতে কি এমন যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, যাহাতে একজন অত্যাচারীকে সিংহাসন-চ্যুত করাইয়া অন্য অত্যাচারীকে বসাইবে? যদি তাহা হয়, তবে আমরা বলি, চাই না সে জয়, যাহাতে সকলের সমান অধি-কার থাকিতে পারে না। সেইরূপ বীর চাই, যাঁহার দ্বারা ভারত সমাজের সকল প্রকার পাপরাশি ধৌত হইতে পারে। যুদ্ধ কিসের জন্য? শান্তি

স্থাপনের জন্য যে দেশে সত্য নাই, যে দেশে ধর্ম্ম নাই, প্রেম নাই, নীতি নাই, ন্যায় নাই, চরিত্র নাই, সে দেশে কি শান্তি থাকিতে পারে? যে দেশে প্রেম নাই, যে দেশে চরিত্র নাই, সে দেশে কি একতা থাকিতে পারে? যে দেশে একতা নাই, সে দেশে কি সুখ শান্তি থাকিতে পারে? যে দেশে একতা নাই, সে দেশের স্বাধীনতাও অধীনতা; যে দেশে স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, সকলের অধিকার সমান নহে, সে দেশ চিরকাল পরাধীন। ধর্ম্ম ভিন্ন কখনও স্বাধীনতা টিকিতে পারে না, যেখানে ধর্ম্ম নাই—সেখানেই একাধিপত্য। এ সকল সার সত্য। যদি ভারতে ম্যাট্‌সিনির ন্যায় কোন সত্যপরায়ণ প্রকৃত চরিত্রবান্ মহৎ বীরের উত্থান হয়, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাপিত বক্ষ শীতল করি। নচেৎ সিজর চাই না,—নেপোলিয়ন চাই না—আলেক্‌জাণ্ডার চাই না—ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ চাই না। সে-ই প্রকৃত বীর, সে ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, মানব সম্প্রদায়কে জাতি নির্ব্বিশেষে চতুর্দ্দিকে একাসনে উপবেশন করাইয়া, আপনার কর্ত্তব্য পালনের জন্য, শত সহস্র নির্যাতনেও অটল থাকিতে পারে। সে-ই প্রকৃত বীর, যে রিপু সংগ্রামে জয়ী, যে পাপ প্রলোভনের দুর্জ্জয় সংগ্রামে জয়ী। মানুষের প্রধান শত্রু পাপ ও প্রলোভন; আর প্রধান শত্রু, রিপু; ইহাদিগকে যে বশে আনিতে পারে, সে-ই প্রকৃত বীর। যদি ভারতে যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সে যুদ্ধ অগ্রে পাপের সহিত, তারপর সমাজের সহিত। যে প্রদেশের ঘরে ঘরে কাটাকাটী, যে দেশের সমাজ-চরিত্র অত্যন্ত দূষিত, যে দেশের রমণীর প্রতি পুরুষের পশুর ন্যায় ব্যবহার, সে দেশে অন্য প্রকার যুদ্ধ আর কি হইবে?—কি হইতে পারে? যে দিন ভারতের গৃহে গৃহে ম্যাট্‌সিনির ন্যায় বীরের উত্থান দেখিব, সেই দিন বুঝিব, জয়লাভ এদেশে সহজ কথা। ঈশ্বর করুন্, যে পরিশুদ্ধ বায়ু এখন ভারতে পরিচালিত হইতেছে, এই বায়ুতে ভারতে কোটি কোটি সত্যপরায়ণ প্রকৃত চরিত্রবান্ ধার্ম্মিক বীরের উত্থান হউক্। ঈশ্বর করুন্, ম্যাট্‌সিনির ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু বীর এই জরাগ্রস্ত ভারতে আগমন করুক্।

কর্ত্তব্যের অনুরোধ।

"More powerful upon me than any advice or any danger, were the exceeding grief and anxiety of my poor mother. Had it been possible for me to have yielded, I should have yielded to that." *Joseph Mazzini.*

এই পৃথিবীতে এতকাল অবস্থিতি করিয়াও, একটী সমস্যা আমরা পূরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। মানব, অবস্থানুসারে যতই অলস হউক না কেন, কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। আমিও কার্য্য করি, তুমিও কর; রামাও করে, শ্যামাও করে। আমরা কিজন্য কার্য্য করিয়া থাকি? বিদ্যালয়ের ছাত্র দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কত পুস্তক স্মরণ শক্তিতে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান্। শিক্ষক ক্রমাগত ৪।৫ ঘণ্টা ছাত্রের পাঠ লইয়া যুদ্ধে রত। কেরাণী সকল সুখ ত্যাগ করিয়া মসি-যুদ্ধকেই সার জ্ঞান করেন। আবার লেখক কত চিন্তার তরঙ্গ ভেদ করিয়া কত অমূল্য ধন সঞ্চয় করেন। হিতৈষী কত পরিশ্রম করিয়া অন্যের উপকার করিতে সচেষ্ট। এ সকল কেন? কৃষক ফলের আশায় শস্য বপন করে; কিন্তু সেই ফল না পাইলে কি তাহার মন বিচলিত হয় না? আমরা সরলভাবে বলি, কেবল কৃষক কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি রূপ এবং উপাধি প্রাপ্তির পর ধনরূপ ফলের আকর্ষণ না থাকিলে, আমাদের দেশের ছাত্রের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ কমিয়া যাইত। শিক্ষকের অর্থের আশা না থাকিলে, তাঁহারা আর ঐ মহৎ ব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক হইতেন না;—কেরাণী মহলের হাহাকারে দিক্ পূর্ণ হইত; লেখক পুরস্কার না পাইলে এ দেশে আর পুস্তক প্রচারিত হইত না; যশ মানের কুহকিনী আশা না থাকিলে হিতৈষী নাম এদেশে কেহ পাইত না।

আমরা যে সমস্যা পূরণ করিতে পারি না, তাহা এই,—লোক এইরূপ সামান্য ২ স্বার্থের আশায় কেন কার্য্যে রত হয়? কেন নৈরাশ্যে তাঁহাদিগের অন্তর কাঁপিয়া যায়? বিভীষিকায় কেন তাঁহারা কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে? আমরা আমাদিগের সামান্য জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়াছি,—আমাদের দেশে প্রকৃত কর্ত্তব্য-জ্ঞান একেবারেই নাই। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মহত্ব আমাদের দেশের লোকেরা অদ্যাবধিও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়াই, তাঁহাদিগের জীবন, ঘূর্ণায়মান্ বায়ুর ধূলির ন্যায় অস্থির ও অবলম্বনশূন্য হইয়া নৈরাশ্যে আত্মসমর্পণ করে এবং অল্পেই কাতর হইয়া পড়ে। ফল না পাইলে ফলবাদীদিগকে কে রক্ষা করিতে পারে?

সৌভাগ্যক্রমে আমরা এমন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যখন আমরা অনেক কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের সহিত পরিচিত হইতেছি। অন্যান্য দেশের কথা আমরা উল্লেখ না করিলেও পারি। ইটালির যে সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মার লেখা হইতে আমরা এই প্রবন্ধের উপরে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, এই মহাত্মা

এক জন আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁহার নাম অনন্ত কাল পর্য্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে অঙ্কিত থাকিবে। এই যে নির্জ্জীব দেশে আমরা বাস করিতেছি, এদেশেও আমরা এমন একটী মহাত্মার নাম করিতে পারি, যিনি আপন কর্ত্তব্য পালনের সময়ে আপন পুত্রকে মৃত্যু-শয্যায় শয়িত দেখিয়াও কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই! কর্ত্তব্য-জ্ঞানের শক্তি, স্বার্থের ক্ষমতা হইতে সহস্র গুণে প্রবলতর। কর্ত্তব্যের অনুরোধের এমনি শক্তি যে, যতক্ষণ মানব আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মন সুস্থ হয় না। কর্ত্তব্যের ভার মস্তকে লইয়া যখন তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন্, তখন কাহারও সাধ্য নাই, তাঁহাদিগকে ফিরাইতে পারে। সংসারের যশ মানের স্বপ্ন, অর্থের মহীয়সী শক্তি, লোকের ঘৃণা বা দ্বেষ, অসহ্য যাতনা, ইহারা প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহারা অধ্যয়ন করেন, কেবল জ্ঞানের জন্য, আপন কর্ত্তব্যের অনুরোধে; তাঁহারা পুত্রকন্যাদিগকে পালন করেন কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে; তাঁহারা সংসারের সকল কার্য্য করেন, কেবল ঐ এক মোহিনী শক্তি কর্ত্তব্যের অনুরোধে। আমরা বলি, যদি মানবের মানসিক শক্তি নিচয়ের মধ্যে এমন কোন গুণ থাকে, যাহাকে অন্যে পূজা করিতে পারে, তাহা এই কর্ত্তব্য-জ্ঞান। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যাহার অন্তরে ইহার শক্তি অঙ্কুরিত, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য।

কর্ত্তব্যের অনুরোধ সকলের এক প্রকার নহে, তাহা ঠিক্ কথা। সকল সময়ে আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাও সহজ কথা নহে। বিবেক, সৎশিক্ষার দ্বারা উন্নীত না হইলে, অনেককে অন্ধকারে লইয়া যায়, তাহাও ঠিক্, অর্থাৎ বিবেক কুসংস্কারের দ্বারা মলিন হইলে সততই মানবকে অন্ধ করে।

শরীরের পক্ষে যেমন চক্ষু সহায়, মনের পক্ষে তেমনি বিবেক। কিন্তু ইহা যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন আর কে মানবকে ঠিক্ রাখিতে পারে? উপায় আছে। উপায়—অতীত মানবের সম্মিলিত স্বর। আমরা স্বীয় স্বীয় বিবেক দ্বারা সর্ব্বদা চালিত হইলেই যে সৎপথে চলিয়া যাইতে পারি, তাহা নহে; বিবেকের সহিত যখন অতীত সময়ের সম্মিলিত স্বরের ঐক্য থাকে না, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমরা ভ্রম দ্বারা চালিত হইতেছি।

স্বীয় স্বীয় বিবেককে পবিত্র ও পরিষ্কৃত করা যেমন উচিত, সেই প্রকার অতীত সময়ের মানবমণ্ডলীর সম্মিলিত স্বরকে মান্য করা উচিত। কর্ত্তব্যপরায়ণ তিনি, তিনি বিবেক ও মানবের সম্মিলিত স্বরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

জীবনপণে স্বীয় কর্ত্তব্যের পথে বাহির হন। সঙ্গীত-মুগ্ধ হরিণ শিশু যেমন সকল ভুলিয়া সঙ্গীতের স্বরই শুনিতে পায়; বৎস-হারা গাভী যেমন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সকল ভুলিয়া, বৎসের পশ্চাৎবর্ত্তিনী হয়, সেই সকল মহাত্মারা, সেই প্রকার, সকল ভুলিয়া, কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জীবন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। সংসারের সুখ ও দুঃখ, সংসারের জ্বালা ও যন্ত্রণা কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। এই জন্যই মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি জীবনের এক তৃতীয়াংশ কারাগারে থাকিয়াও সুখানুভব করিতেন, এই অনুরোধেই তিনি সহস্র সহস্র অত্যাচারের ভীষণ আক্রমণেও আপন পথ পরিত্যাগ করেন নাই। যদি আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে লেখনী ধরিতে শিখিয়া থাকি—কারাবাস আমাদের পক্ষে সুখ; যদি স্বজাতির উন্নতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান ধাবিত হইয়া থাকে, সকল কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি অম্লান বদনে। আর যদি সে প্রকার কর্ত্তব্যবোধ আমাদের না হইয়া থাকে, আমরা নিশ্চয় নিরাশান্ধকারের বিভীষিকা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া যাইব, এবং কম্পিত কলেবরে আপন পথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব; নচেৎ কে আমাদিগকে বিচলিত করিবে? এই পৃথিবীর মধ্যে কে বিচলিত করিতে সমর্থ? যে দিন এইরূপ কর্ত্তব্যানুরোধের মোহিনী আকর্ষণে দেশবাসী সকলে মিলিয়া আপন পথে চলিতে থাকিবে, সে দিন আমরা এক শুভদিনের অভ্যুদয় দেখিয়া মোহিত হইব। কিন্তু সে দিন কি আসিবে?

জাতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম্মনীতি।

এই খলতাময় জগৎ সংসারে যেমন মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্মবল না থাকিলে, তাহার জীবন ফেণায়মান জলবিম্বের ন্যায় কিম্বা ঘূর্ণায়মান বায়ুর ধূলির ন্যায় অবলম্বন-শূন্য হইয়া ক্ষণকাল আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এবং অচিরাৎ সংসারের অন্য মত-পরমাণুতে বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রকার, জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্মনীতির সুমধুর ভাব এবং মাধুর্য্যের আকর্ষণ না থাকিলে, তাহা দিন কয়েক পাঠকগণের খেয়াল, সন্তোষ বা আসক্তি পরিতৃপ্ত করিয়া, অসময়ে সময়-গহ্বরে লুক্কায়িত হয়। যে দেশের জাতীয় সাহিত্য যত সুনীতির

উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশের জাতীয় সাহিত্য তত সুদৃঢ় এবং মানবের কল্যাণকর। আমরা অদ্যকার প্রবন্ধে, জাতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম্মনীতির মধ্যে যে একটী অকাট্য বন্ধন আছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিতে অধিকতর প্রয়াস পাইব।

জাতীয় সাহিত্য ও ধর্ম্মনীতিতে এমনই অকাট্য বন্ধন যে, ইহাদিগের একের অভাবে অন্য জ্যোতিবিহীন, অসার এবং অকিঞ্চিৎকর। জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্ম-নীতি শোভিত না হইলে, সে সাহিত্য ভোগ-বিলাসপ্রিয় অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের আদর পাইলেও, চিরকাল উদার চরিত্রবান জ্ঞানীর চক্ষে তাহা বিষবৎ পরিত্যক্ত। যে সাহিত্য আপামর সর্ব্ব সাধারণের সেবার যোগ্য নয়, তাহা কখনও জাতীয় সাহিত্য হইতে পারে না। ধর্ম্মনীতির দ্বারা সমুজ্জ্বল না হইলে সাহিত্য এই প্রকার সঙ্কীর্ণতায় পরিম্লান হয়। বঙ্কিম-বাবু-প্রমুখ বহু ঔপন্যাসিকের প্রণয়কাহিনী-পূর্ণ গ্রন্থরাশি আজ বঙ্গবাসীদের ঘরে ঘরে পূজা অর্চ্চনা পাইতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য সমূহের নীতি-বিবর্জ্জিত ভাব দেখিয়া আজ আমাদের কথার সারত্ব অনুভব করিতে কে সমর্থ হইবেন? এদেশের সাহিত্য-সংসার দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে বলিয়া সকলেই আনন্দ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে সাহিত্য মানবের চির কল্যাণকর, এবং চিরকালের আদর পাইবার যোগ্য, সে প্রকার গ্রন্থ কোথায়? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যে গ্রন্থে কেবল প্রণয়ের ছড়া-ছড়ি, কিন্তু নীতির সমুজ্জ্বল ভাব নাই, আমরা বলি, যে গ্রন্থে কেবল সার-বিহীন, উপদেশ-শূন্য বাক্যের আড়ম্বর, তাহা আজ সমাজে আদর পাইলেও এমন এক সময় আগমন করিবে, যখন তাহা ঘৃণার্হ বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী কথা। চাকচিক্যময় যৌবনে বারাঙ্গনাগণের মুখের শ্রী ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগৎসংসার মোহিত হইতে পারে, কিন্তু যৌবনের অন্তে আর সে প্রকার আদর থাকে না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশে যদি প্রকৃত জ্ঞানী থাকেন, তবে তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, বঙ্গদেশের নীতি-বিবর্জ্জিত গ্রন্থসমূহ অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী। আমরা বলি, যে গ্রন্থ জীবন গঠনের সহায় না হইয়া তাহাকে বিপদগামী করিতে যত্নবান, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। যে স্থানে এ প্রকার গ্রন্থ অপ্রতিহতপ্রভাবে সকলের আদর পায়, সে দেশ চিরকাল কুসংস্কার অন্ধকারের কুক্ষিগত। যে দেশে বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, সত্য আছে,

ন্যায় আছে, জ্ঞান আছে, প্রেম আছে, সে দেশের নীতি-বর্জ্জিত গ্রন্থ কখনও জাতীয় সাহিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্য তাহাই,—যাহা চিরকাল জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং উন্নতির মূলে বল সঞ্চয় করিতে সমর্থ। জাতীয় সাহিত্য তাহাই, যাহার বলে মৃত, নিস্তেজ, নীরব জীবনে বীর্য্য সঞ্চার হয়, হৃদয় সাহসে উদ্দীপ্ত হয়, এবং মানব কর্ত্তব্য পালনের জন্য ব্যাকুল হয়। কে বলে এ সংসারের নীরস কমলের ক্ষমতা মানবের অন্যান্য ক্ষমতা অপেক্ষা নিস্তেজ? কে বলে, রক্ত-সঞ্চালিত হস্তের বল অপেক্ষা জড়পদার্থ লেখনীর ক্ষমতা অল্প? ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে বহু ক্ষমতাশীল রাজা যাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, ভল্‌টেয়ার, রুসো, রুজে প্রভৃতি আপন লেখনী বলে তাহা সাধন করিয়া গিয়াছেন। আবার ইটালীতে যাহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্তের মধ্যে আদর্শ স্থানীয়। এক ম্যাট্‌সিনির লেখনীর তেজেই আজ ইটালীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনি জাতীয়-সাহিত্যে যে বল সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার বলেই আজ ইটালী আবার স্বাধীনতা লাভ করিয়া পৃথিবীর নিকট সহাস্য মুখে কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি কি কেবল প্রেমের কথা, প্রণয়ের কাহিনী লিখিয়া জাতিকে উন্নত করিয়াছেন? না—কেবল ধর্ম্মনীতি এবং মানব প্রেমের মহোচ্চ চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ইটালী মুগ্ধ হইয়াছে, সেই দৃশ্যে ইটালী অলৌকিক বীর্য্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা যত উদ্‌ঘাটন করিব, ততই প্রতীয়মান হইবে, জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন কখনও মানবজাতি উন্নত হইতে পারে না, আর সেই জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্মনীতি না থাকিলে তাহার দ্বারাও সমাজের উপকার সাধিত হয় না। জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, পরস্পর সমসাময়িক। একের উন্নতি ভিন্ন অপরের উন্নতি অসম্ভব। জাতি যেরূপ সাহিত্যও তদ্রূপ, সাহিত্য যেরূপ জাতিও সেই-রূপ। একে অপরের ছায়া প্রতিফলিত। সাহিত্য উন্নত না হইলে জাতির উন্নতি নাই। ধর্ম্ম ভিন্ন সাহিত্যের উন্নতি নাই। যতদিন জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্ম-নীতি প্রবেশ না করে; ততদিন ধর্ম্মনীতি হীনপ্রভ হইয়া জগতে অনাদরে থাকে। জাতীয় সাহিত্য যেমন ধর্ম্মনীতি ভিন্ন অমঙ্গলের সোপান, সেই প্রকার ধর্ম্মনীতি সাহিত্য ভিন্ন সৌন্দর্য্যবিহীন নীরস কাহিনী। যে দেশের লোকেরা বিদ্বান, জ্ঞানী, ন্যায়বান, সেই দেশই উন্নত এবং সেই দেশের জাতীয় সাহিত্যই নীতির দ্বারা সমুজ্জ্বল, এবং সেই দেশের সাহিত্যই মানবের মনে

অলৌকিক বল সঞ্চারে সমর্থ। আবার অন্যদিকে যে দেশের সাহিত্যে ধর্ম্মনীতি অণুপ্রবিষ্ট, সেই দেশের ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত, স্থায়ী, অচঞ্চল এবং সুদৃঢ়। পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যে এত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্যের গুণেই ইহা মানবহৃদয়ে অলৌকিক আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আর্য্যভূমির তখনই উন্নতি হইয়াছিল, যখন ধর্ম্মমূলক আর্য্যসাহিত্যের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মহা জ্ঞান গরিমাও আর তদনীন্তনের কুসংস্কারময় ভাব সকল মানব মন হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া যাঁহারা পঙ্কিল ভাব-সমুদ্র মন্থন করিয়া অসার রত্ন গ্রথিত করেন, তাঁহাদের পুস্তক আজ জনসমাজে আদৃত হইলেও, চিরকাল সেরূপ হইবে না। হইলেও, সেই সঙ্গে সমাজের অধোগতি হইবে। সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইলে, কখনও কুরুচিপূর্ণ অসার গ্রন্থ আদৃত হইবে না। আবার যাঁহারা সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সত্য সকল আজ যে প্রকার আদৃত, চিরকাল সে প্রকার থাকিবে না। কেননা, বক্তৃতার কথা আকাশে নিবিয়া যায়, পুস্তকের কথা চিরকাল স্থায়ী। পথ এক—অবলম্বন এক। এই পথে, সম্মিলন। জাতির সাহিত্য-লেখক যে দিন নীতিপরায়ণ হইবেন, সেই দিন সাহিত্যে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য শোভা পাইবে, এবং সেই দিন হইতে সাহিত্য মানবের কল্যাণকর হইবে। জাতির ধর্ম্ম ও রাজনীতি-প্রচারক যে দিন অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সৎ-সাহিত্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই দিন দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, সেই দিন দেশের সাহিত্য উন্নত হইবে। ধর্ম্মনীতি সে দিন উপেক্ষিত হইবে না, এবং মানবের মন নিশ্চয় সে দিন কুসংস্কার অন্ধকারে বিচরণ করিয়া সুখ পাইবে না। অসার গ্রন্থ সে দিন অসার সংসারের জঘন্য ধূলিরাশিতে মিশিয়া যাইবে। কিন্তু সে দিন কি এদেশে আসিবে।!

জাতীয় জীবন এবং ভারতের দুর্ভিক্ষ।

প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে এমন একটী বিন্দু আছে, যে বিন্দুতে আঘাত করিলে সে অন্যের জন্য অস্থির হয়। ইহার অভাবে, পরস্পরের মুখশ্রীতে এক

অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া, জনসাধারণ, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইত না ; অথবা এ সংসারে কেহই সমাজে আবদ্ধ হইয়া বাস করিত না। সমাজ-বন্ধনই বল, আর যাহাই বল, সকলের মূল সেই বিন্দুতে নিবদ্ধ। আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাইয়া থাকি, স্বার্থ এবং অন্য নানা প্রকার অসৎ বৃত্তির পরাক্রমে কখনও কখনও সেই বিন্দুটী ম্লান হইয়া যায় ; সেই সময়ে আর কাহারও মন অন্যের জন্য অস্থির হয় না। কে না স্বীকার করিবেন যে, প্রেম ও ভালবাসা মানবের হৃদয়ে বিশ্বনিয়ন্তার প্রত্যক্ষ ছবি ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সময়ে সময়ে আমরা এ ছবিকেও সংসারের স্বার্থের কালিমা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলি। অস্বাভাবিক ভাব এবং কৃত্রিম শোভা সৌন্দর্য্য লইয়াই বর্ত্তমান সময়ে মানুষেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই জন্য বহু চেষ্টাতেও সেই সুন্দর স্বর্গীয় প্রেমের ছবি আর মনুষ্যের হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন দেশের এমনই অবস্থা হইয়াছে, ঘরের পার্শ্বে অনাহারে লোক মরিলেও সে দিকে কেহ ফিরিয়া চায় না, কিন্তু নাম কিনিবার জন্য ভিন্ন দেশের দুর্ভিক্ষেও অর্থ সাহায্য করে। ভাই ভাইয়ের জন্য খাটিয়া প্রাণ দিবে, ইহার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য কি আছে ? বাহিরের আড়ম্বর, সভ্যতার স্রোতের সুফলই বল, কুফলই বল, সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের নিকট স্থান পায় না। আমরা এই জরাগ্রস্ত সংসারে যখন দেখি, একজনের কষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করিয়া অন্যের নয়নের জল অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, এক জনের সম্মুখের অন্ন সন্তোষের সহিত ক্ষুধিত জনের জীবন রক্ষার জন্য বিতরিত হইতেছে, তখন বাস্তবিক হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করি। ঈশ্বরের সৃষ্টির গুপ্ত মন্ত্রই এই, আমরা সমাজ-বদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগ করিলে মানবের মনে কত কষ্ট হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। বাস্তবিক আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন এক আকর্ষণের বস্তু আছে, যাহাতে ভাই, তুমি আমার প্রতি এবং আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত এবং আকৃষ্ট। এই ভাব কি কেবল মানব-প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ? না, তাহা নহে। ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও এভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এক জাতীয় জীব সর্ব্বদাই সেই জাতীয় জীবের সহিত পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিতে ভালবাসে। এক জাতীয় একটী প্রাণীকে দূর স্থানে দেখিলে, সেই জাতীয় অন্য প্রাণী, তাহার নিকটবর্ত্তী না হইয়াই পারে না। আমরা বিশ্বনিয়ান্তর এই ভাবকে একেবারে নষ্ট করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু স্বার্থের চিন্তায় মানবকে অনেক সময়েই অসার করিয়া থাকে, তজ্জন্যই সময়ে সময়ে মানবের

মহত্ত্ব নির্জীব ও শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়। তখন মানুষ অনাহারে মরিতেছে দেখিলেও সে দিকে তাকায় না।

এই যে ভাবের কথা আমরা বলিলাম, ইহার আবার অধ্যায় আছে। সত্য বটে, এ সংসারে তাঁহারাই মহৎ, যাহারা জাতিবর্ণ ভুলিয়া সকল মানবের প্রতি সমান আকৃষ্ট। সকল মানবকে যাঁহারা সমান ভাবে ভালবাসিতে সমর্থ, তাঁহারা এ সংসারে পূজা পাইবার উপযুক্ত। সে প্রকার মনুষ্যের অস্তিত্ব অন্য দেশে সম্ভব হইলেও, আমাদের দেশে নাই; কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা স্ববর্ণ, স্বজাতিকেও ভালবাসায় হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের দেশের লোক, মনুষ্যত্ব মূলক যাহা কিছু সে সকল ভুলিয়া আপনার স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। আমাদের দেশের লোক স্বার্থের ক্ষতি করিয়া মহত্ত্ব বিস্তার করিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের দেশের লোক কেবল আড়ম্বর ও বাহ্যিক রকমে অন্যের সহিত মিলিত হইতে চাহেন। মূল কথা, তাঁহারা প্রাণ বিনিময় করিতে চাহেন না। মূল কথা, যে দেশে জাতীয় জীবন নাই, সে দেশে সে প্রকার বিশ্বজনীন প্রেম অসম্ভব। আমরা, স্বীয় দেশের লোক, যাহাদের সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করি, যাহাদের সহিত আমাদের রক্তের সম্বন্ধ, যাহাদের আকৃতিতে বর্ণ-বৈষম্য নাই, আচার ব্যবহারে বিভিন্নতা নাই, আমরা তাহাদিগকেও স্বার্থত্যাগ করিয়া প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারি না। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয় যে, যে দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশের জল বায়ুতে আমাদের শরীর বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমরা সকলে মিলিয়া সেই মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছি না? যে জাতীয় জীবনকে পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিরা সঙ্কীর্ণ ভাব বলিয়া থাকেন, আমরা সেই ভাবও উপার্জ্জন করিতে অসমর্থ! যখন আমরা এই সকল কথা ভাবি, তখন ভারতের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা বাহ্যজ্ঞান হারাই,—কেবল গোপনে অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকি। তখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, হায়, এ দেশের অবস্থা কি আর উন্নত হইবে না? এক হৃদয় কি অন্য হৃদয়ে মিলিবে না? এক জনের স্বর শুনিয়া কি অন্য সকলে একত্রিত হইবে না? এক জনের দুর্দ্দশা দেখিয়া কি অন্যের চক্ষে জল আসিবে না? আবার ভাবি, যদি সে অবস্থা না হয়, তবে কি কখনও আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব? যদি সে সুন্দর অবস্থা এই হতভাগ্য দেশে শোভা না পায়, তবে কি আমরা মনুষ্য বলিয়া জগতে পরি-

চিত হইতে পারিব ? তাহা অসম্ভব। এ পৃথিবীতে যে দেশের ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা, সেই দেশই অনুন্নত ; আর যেখানে একতা, সেই দেশই উন্নত, সেই খানেই স্বাধীনতা বা মানবের মহত্ত্ব বিস্তার। আমরা যতদিন প্রত্যেকে দূরে থাকিব, ততদিনই আমরা জগতে হেয় থাকিব ; যতদিন আমরা অন্যের প্রেমে আকৃষ্ট না হইব, ততদিন আমরা জাতীয়-জীবন কাহাকে বলে, বুঝিতে পারিব না ; এবং ততদিন নীরবে আমরা পশুর অপেক্ষাও হেয় ভাবে এ সংসারে বিচরণ করিব। মানবের মধ্যে যে স্বর্গীয় শক্তি দেখিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই, সে শক্তি একতা হইতে উৎপন্ন। আমরা মানব জীবনের যে অলৌকিক ভাব দেখিয়া সময়ে সময়ে মোহিত হই, সে ভাব জাতীয়জীবন হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক যে দেশে জাতীয় জীবন নাই, সে দেশে বিশ্বজনীন প্রেমবিস্তার কি, তাহা অনুভব করিতেও সে দেশের নরনারী অক্ষম এবং সে দেশ চিরকাল জগতে হেয় ও ঘৃণিত। বাস্তবিক. আমাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে কি বোধ হয় যে, আমরা মানুষ ? যদি তাই হই. তবে সে সুন্দর প্রেম-বিন্দু কোথায়, যাহা থাকিলে মানব অন্যের দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারে না ? আমরা কি মানুষ ? যদি তাই হই, তবে অন্যের কষ্ট দেখিলে আমাদের প্রাণ কাঁদে না কেন ? আমরা কি মানুষ ? যদি তাই হইব, তবে ভারতের এই দুর্দ্দশার সময়েও সুস্নিগ্ধ শীতল বায়ু গায়ে লাগাইয়া, ক্ষণস্থায়ী সৌভাগ্যের সেবা করিতে করিতে, বাই খেমটার নাট্যশালায়, মাদকালয়ে, এবং বারাঙ্গনালয়ে নিমেষ মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইয়া দিব কেন ? কি আক্ষেপের বিষয় ! ভাবিলে কি শরীর রোমাঞ্চিত হয় না ? দেশের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিলে কি হৃদয় ও মন অবসন্ন হয় না ? কি আক্ষেপের বিষয়, ইংরাজজাতিকে তিরস্কার করিবার সময় আমরা প্রস্তুত, কিন্তু স্বীয় জাতির অভাব মোচন করিবার চিন্তাও আমাদের মনে স্থান পায় না ! ! বেহার, বম্বে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ, এবং পূর্ব্ব-বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এ ভারতে দুর্ভিক্ষ চির আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে দেশে লক্ষ লক্ষ প্রাণী দুর্ভিক্ষের ভীষণ কবলে পতিত, সে দেশের লোকের কি অন্য চিন্তা করিবার সময় আছে ? যে দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণীর আর্ত্তনাদে গগন পরিপূর্ণ, সে দেশে যদি মনুষ্য থাকে, তবে তাহারা কি অন্য চিন্তা করিয়া সময় কর্ত্তন করিতে সমর্থ ? অনেকে বলেন, সমর্থ বই কি ! নচেৎ আমাদের দেশে কি দেখিতেছি ? আমরা বলি, আমাদের দেশে এখন আর প্রকৃতিস্থ মানব নাই। একা বিদ্যাসাগর ছিলেন, তিনি

চলিয়া গিয়াছেন। এখন যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই রোগগ্রস্ত। আমরা বলি, যে প্রেমের আকর্ষণে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, সেই প্রেমের ছবি স্বার্থের কালিমায় মলিন হইয়া গিয়াছে। আমরা বলি, যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, এ সকলই শ্মশানের ছবি। আমরা বলি, এদেশে ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা কেবল শ্মশান বই আর কিছুই নহে। আন্দোলনই বল, রাজনীতির কুহকের কথাই বল, ভাই, এ সকল কাহার জন্য? তুমি একা সভ্য হইবে, একা স্বাধীন হইবে? আপনি স্বাধানতার আস্বাধন অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবে বলিয়া কি তোমার এত পরিশ্রম? ভাই,—স্বাধীন দেশে গমন কর। যে দেশের বায়ু পরাধীন, যে দেশের জল পরাধীন, সে দেশে একা তুমি কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না। জাননা কি, এদেশের কোটী কোটী লোক রিপুর অধীন, সমাজের অধান, রাজার অধীন? যদি বল, চেষ্টা করিয়া এ দেশকে স্বাধীন করিবে, তবে অগ্রে দেশের প্রাণ বাঁচাও, অগ্রে সকলের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হও। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া যদি এ দেশের সহস্র যুবক অগ্রসর হয়, তবে কি দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি দূর করিতে পারে না? ভাই, নৈরাশ হও কেন? জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চার কর, এক জনের দুঃখ দূর করিতে যাহাতে সহস্র জন অগ্রসর হয়, তাহা করিতে যত্ন কর। যদি কোন শক্তি না থাকে, অবিরত বিধাতার নিকট প্রার্থনা কর। যতদিন তাহা না করিবে, সকলই বৃথা; যত দিন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়া যাইতেছে দেখিয়া অন্য লক্ষ লক্ষ লোক হাসিতে থাকিবে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ততদিন এ দেশের কিছু হইবে না। সময় ত উপস্থিত, জাতীয় সহানুভূতি দেখাইবার ইহাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট সময় কি হইতে পারে? যদি ভারতের প্রত্যেকে ১০ করিয়া প্রদান করে, কত টাকা হইয়া যায়। অন্যের ভাবনা এবং অন্যের মঙ্গল কামনার ন্যায় বিমল সুখ আর কিছুতেই নাই। এমন সুন্দর ছবি আর কোথাও নাই। ভারতের এক বিভাগের কষ্টের কথা শুনিলে চতুর্দ্দিক হইতে যে দিন একটী একটী পয়সা সংগৃহীত হইয়া কোটী কোটী টাকা সংগৃহীত হইবে, সে দিন বুঝিব, এ দেশে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে; এবং সেই দিন আশা করিব, এ দেশের ভাবী ইতিহাসে উন্নতি আছে। যদি তাহা না হয়, কয়েক বৎসর পরে এ ভারতে যাহা দেখিব, তাহা কেবল হৃদয়-শূন্য, মনুষ্যত্ব-শূন্য শ্মশানের ছবি।

মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য।

"We must convince men that they are all sons of one sole God, and bound to fulfill and execute one sole law here on earth; that each of them is bound to live, not for himself, but for others; that the aim of existence is, not to be more or less happy, but to make themselves and others more virtuous; that to struggle against intustice or error (wherever they exist) in the name and for the benefit of their brothers, is not only a right but a duty; a duty which may not be neglected without sin, the duty of their whole life." *Joseph Mazzini.*

ভারতবর্ষের যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ইহার মধ্যে মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা যে আমরা না বুঝি, তাহা নহে। আমরা অনেক সময়ই ফলের প্রতি চক্ষুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, কিম্বা রাখিতে ইচ্ছাও করি না। ফল-নিরপেক্ষ হইয়া আমাদিগের প্রতীতি আমরা সাহস সহকারে জনসমাজে প্রচার করিবই করিব। ফল হয় ভালই, না হইলেও কি আমরা আমাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করিতে পারি?

কি সমাজসংস্কারক, কি ধর্ম্মনীতিজ্ঞ, কি সংশয়বাদী, ইহারা সকলেই এক মুখে বলিবেন, মানব জীবনের কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে। সময়-ভেদে, রুচি-ভেদে, অবস্থাভেদে ও শিক্ষাভেদে যদিও সে উদ্দেশ্য নানা বিভাগে পরিণত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া কেহই, জীবনের উদ্দেশ্য নাই, এ কথা বলিতে পারেন না। পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র অল্পে অল্পে পদ সঞ্চালন করিয়া ঐ যে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, উহা কিসের জন্য? আর ঐ যে ধনী দ্বিতল অট্টালিকায় সুখের হিল্লোলে নৃত্য করিতেছেন, এবং চতুর্দ্দিকে সেই তালে তালে আর শত সহস্র অধীনস্থ লোককে নাচাইতেছেন, উহাই বা কিসের জন্য? মাতা সংসারের সকল পরিত্যাগ করিয়াও ঐ যে পুত্রের প্রফুল্ল মুখ-কমল দেখিয়া আশার পর আশার লীলা দেখিতেছেন, উহাই বা কি, আর ঐ যে ধার্ম্মিক সকল বিপদের মধ্যে এক অবলম্বন ধরিয়া অটল ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, উহাই বা কি? সকলেই বলিবেন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক;—মানব-জীবনের কর্ত্তব্যপালন। এই সংসারে সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য আছে, এবং সকলেই সেই উদ্দেশ্য সাধনে রত। বিশ্বনিয়ন্তার এই যে অকাট্য বন্ধন, ইহা কেহই ছিন্ন করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে মানবের একটী সার উদ্দেশ্য আছে, যাহার জন্য সমস্ত সংসার ব্যস্ত। অবিশ্বাসী কিম্বা সংশয়-

বাদী আপন মত বজায় রাখিবার জন্য মুখে যাহাই বলুন না কেন, অন্তরে অন্তরে সেই উদ্দেশ্য অভিমুখে অলক্ষিতভাবে সকলেই অগ্রসর হইতেছেন, এবং সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই, সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় কিম্বা প্রলোভনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া অগম্য পথে পাদচারণা করিয়া কৃতার্থ হন ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহাদিগের জীবন আশু সেই মহৎ উদ্দেশ্য পানে ধাবিত না হইলেও এমন একদিন আসিবে, যে দিন তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের অভাব বুঝিয়া আবার গম্য পথে উপস্থিত হইবেন। যিনি যে পথেই বিচরণ করুন না, সকলের জীবনের উদ্দেশ্যই এক, সকলের জীবনের লক্ষ্যই এক। যাঁহারা পূর্ব্বাবধি আপন পথ বাছিয়া লইতে পারেন, তাঁহারাই এ সংসারে ধন্য। যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই সেই উদ্দেশ্যের পানে ধাবিত হন, তাঁহারাই এসংসারে সুখী। অনেকে বলিবেন, তাহাই যে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই,—মানব অন্য পথে বিচরণ করিয়া কখনও সুখ ও শান্তি পায় না। যদি ইচ্ছা হয়, আমাদিগের কথার প্রমাণ সংগ্রহ কর। পৃথিবীর সকল বিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, সকল স্থানেই উত্তর পাইবে, 'এ পথে সুখ ও শান্তি নাই।' আমরা যে পথের কথা বলিতেছি, এই পথে আসিয়া দেখ, কত সুখ ও কত শান্তি। এ সকল কি কল্পনার কথা? না,—ইহার মধ্যে বাস্তবিক সার সত্য আছে।

আমরা মানব জীবনের যে মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় বলিব, তাহা এই,—আপনার স্বার্থ ভুলিয়া পরের জন্য জীবন সমর্পণ করা। আপনার স্বার্থ লইয়া এ সংসারে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চিন্তিত, কিন্তু আপনার স্বার্থকে পরের জন্য বিসর্জ্জন দিতে কে সমর্থ? মানুষ, যখন আপনার সার সম্বল সেই একমাত্র চিরসুহৃৎ বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া, আপন জীবন, বীরের ন্যায় অন্যের অশ্রু মুছাইবার জন্য উৎসর্গ করে, তখন তাহার মুখশ্রী কত সুন্দর হয়! পৃথিবীর একজন বিখ্যাত ধার্ম্মিক বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের জীবন আমাদের জন্য নহে,তাহা অন্যের সেবার জন্য। যাঁহারা অন্যের হৃদয় ও মনকে ধর্ম্ম ও নীতির পথে আনয়ন করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহাদিগের জীবন অসার। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এ সংসারে যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা অন্যের সেবায়। ভারতবর্ষে কি এ প্রকার জীবন আছে? আমাদের স্মরণ হয় না। সে প্রকার জীবনের অস্তিত্ব এ ভারতে কল্পনাও করিতে পারি না।

দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর মনুষ্য,—ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন, মুর্খ, বিদ্যাহীন, এ সংসারের যাহা কিছু আদরের; সে সকল হীন; এই নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য, কই, একজনকেও ত চিন্তা করিতে দেখিতে পাই না। যতদিন এ দেশের নিম্নশ্রেণীর সমস্যা পূর্ণ না হইবে, ততদিন এ দেশের মঙ্গল নাই। তাহারা ধনীর সুদের উৎপীড়নে, জমীদারের অত্যাচারে, রোগে, ও অনাহারে যদি মারা গেল, কে দেশের উন্নতি করিবে? তাহারাই ত দেশের শতকরা ৯২ জন। রাজনীতির আন্দোলন, কিম্বা সমাজনীতির আন্দোলন, ইহা যত দিন না প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর স্পর্শ করিবে,—যতদিন না এদেশের ধনী দরিদ্র সকলে সমানভাবে আপন আপন জীবনের অভাব বুঝিতে পারিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। কই নিম্নশ্রেণীর জন্য কে ভাবে, কে চেষ্টা করে, কে খাটে? দুগ্ধফেননিভ সুখ-শয্যায় শুইয়া কে কবে দেশ উদ্ধার করিতে পারিয়াছে? যদি একটীও পরদুঃখকাতর, পরসেবায় রত জীবনের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমাদের আশা হইত, একদিন এদেশে সমবেত বল কাহাকে বলে, তাহা সকলের হৃদ্‌বোধ হইবে; বুঝিতে পারিতাম, একদিন এদেশের সহানুভূতির ধ্বনিতে সমস্ত ভারতের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে। সে প্রকার ধর্ম্মভাব নাই,—সে প্রকার স্বার্থশূন্য জীবন নাই। তাই দেশের দুরবস্থা অবসান হইয়াও হয় না, এক জনের দুঃখ দূর হইতে না হইতে আর শতজন দুঃখে পতিত হয়। ভারতের কত লোক বিদ্যাহীন, তাহার গণনা কে করিয়াছে? ভারতে কত মনুষ্যের জীবন বর্ত্তমান সময়ে পশুর ন্যায়, তাহা কাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়াছে? এ দেশের কত প্রজা মরণের দ্বারে বিচরণ করিতেছে, কে ভাবে? এ দেশের কত লোক অসহায়, তাহা গণনা করিয়া কাহার নয়ন হইতে জল পতিত হইতেছে? যদি এদেশের কিছু হয়, তবে সেই প্রকার লোকের দ্বারায় হইবে, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থ অন্যের জন্য ডুবাইতে পারিয়াছে। এ দেশে যদি কিছু হয়, তবে তাঁহার দ্বারা হইবে, যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কেবল অন্যের উপকার, যাঁহার ধর্ম্ম কেবল অন্যের সেবা, যাঁহার চিন্তা কেবল অন্যের অভাব দূর করা। সেই প্রকার জীবন যাঁহার আছে, তাঁহার মধ্যে একটী বল দেদীপ্যমান থাকে, সে বল 'ধর্ম্মবল'। এই ধর্ম্মবল ভিন্ন মানব কখনই অধিক কাল কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে না। এই ধর্ম্মবল ভিন্ন মানব যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া অটল থাকিতে পারে না। অনেকে

বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মবল ভিন্নও লোক ভাল থাকিতে পারে। আমরা সে কথা অস্বীকার করি। ধর্ম্ম কোন সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ নয়, ইহা মুক্ত বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত। ধর্ম্ম এই পৃথিবীময়; যেখানে সত্য, যেখানে ন্যায়, যেখানে প্রীতি, যেখানে পবিত্রতা, এক দিকে সেখানে যেমন ধর্ম্ম; সেই প্রকার, যেখানে পরোপকার, যেখানে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, অন্য দিকে সেখানেও ধর্ম্ম। যাঁহারা ধর্ম্মভিন্ন রাজনীতিকে অন্য স্থানে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত রাজনীতির ছবি দেখিতে পান না, তাঁহারা যাহা দেখেন, সে রাজনীতির ছায়া মাত্র। এই জন্যই বৃটিশরাজনীতি দিন দিন এত বিকৃত অবস্থায় আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছে। রাজনীতি যখন ধর্ম্মনীতির দ্বারা সমুজ্জ্বল হয়, তখন প্রকৃত সাজ ধারণ করে, তখন রাজনীতি দ্বারা পৃথিবীর উপকার হয়। যে দেশের যে জাতি দ্বারা যখন ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, সেই দেশের সেই জাতিই তখন রাজ মুকুট পাইয়াছে। আবার ধর্ম্মহীনতার সঙ্গে রাজ্য হতশ্রী হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস এ কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। যখন ধর্ম্ম পরিম্লান হইয়াছে, তখনই একাধিপত্য, পাশব-বল প্রয়োগ—দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া অন্য দেশ লুণ্ঠন, রাজার লক্ষ্য হইয়াছে। তখনই থিব এবং তেকেন্দ্রজিতের ক্ষমতা পাশববলে লুণ্ঠিত হইতেছে। এ সকল রাজনীতির অত্যন্ত ঘৃণিত অঙ্গ। আমরা এ প্রকার রাজনীতির জ্বালায় অহরহ জ্বলিয়া মরিতেছি। যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে, সেই প্রকার সমাজনীতি সম্বন্ধে, সেই প্রকার অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে;—ধর্ম্মই সকলের সার, এবং ধর্ম্মই মানব জীবনের অবলম্বন এবং ধর্ম্ম হইতে যে স্বার্থ-ত্যাগের ভাব মানব মনে উদিত হয়, তাহাই মানব জীবনের প্রকৃত মহৎ উদ্দেশ্য। পরের জন্য জীবন, পরের জন্য সর্ব্বস্ব এবং পরকে আপন জ্ঞান করাই মহত্ত্ব; ইহা যে দিন সকলে বুঝিবেন, সে দিন নিশ্চয় ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর দুর্দ্দশার হ্রাস হইবে; এবং নিশ্চয় সে দিন এদেশ স্বাধীনতার আস্বাদন বুঝিবে। আর তাহা না হইলে কিছুতেই এ দেশের মঙ্গল নাই। হাজার আন্দোলন কর, সব ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় হইবে।

কি প্রার্থনীয়?—সত্য, না ভালবাসা?

পৃথিবীতে প্রকৃত নীতিপরায়ণ মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে নীতিসাধারণের পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত না হইলেও, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে, ক্ষুদ্রমতি দুর্ব্বল মানব একদিক বজায় রাখিতে যাইয়া অন্য দিক ডুবাইয়া দেয়। বাস্তবিক যাঁহারা এ সংসারের সকল দিক রক্ষা করিয়া চলেন, তাঁহারা কখনও নীতিপরায়ণ হইতে পারেন না। নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে জগতের অধিকাংশ লোকই পূজা করিয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? একদিকে যেমন তাঁহারা পূজা পাইয়া থাকেন, অন্যদিকে তাঁহাদিগকে অসংখ্য নিন্দাবাদ, তিরস্কার, গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। এই বিপদসঙ্কুল সংসারে প্রথমে তাঁহারা নীতির জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা মনুষ্যের ভালবাসার মুখাপেক্ষী হইয়া চলিলে যে সত্য রক্ষা হয় না, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রেম মানব-হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভূষণ; যে সকল উৎকৃষ্ট গুণের অস্তিত্বে মানব পশু শ্রেণী হইতে উচ্চ আসন লাভে অধিকারী, সে সকল গুণের মধ্যে প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের এই কোমল অথচ মনোমুগ্ধকর চিত্র, জরাজীর্ণ সংসারে, এই প্রেমে নিবদ্ধ দেখি বলিয়াই, পৃথিবীকে সুখের আলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই প্রেমের আকর্ষণে জগৎব্যাপী ভ্রাতা ভগ্নীর মুখের শ্রীতে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য বিদ্যমান দেখিতে পাই বলিয়া, সংসারকে আবাসের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করি, নচেৎ ইহা নিরয়-নিবাস হইতেও ভয়ানক হইত;—না হইলে ইহা পিশাচেরও বাসের অযোগ্য হইত।

আমরা যে ভালবাসার কথা বলিতেছি, ইহা প্রেমের রূপান্তর কিন্তু একটু বিভিন্ন প্রকারের। প্রেমের পথে বিচরণ করিতে যাইয়া অনেক সাধক, বা ধার্ম্মিক মধ্যে মধ্যে পবিত্রতা হারাইয়া যেমন ইহাকে অপবিত্র করিয়া তুলেন, অর্থাৎ এই পবিত্র প্রেমের চিত্রকে কালিমা দ্বারা মলিন করিয়া ফেলেন, সেই প্রকার প্রেমের রূপান্তর যে ভালবাসার কথা আমরা বলিতেছি, ইহা হৃদয়ে উপার্জ্জন এবং পোষণ করিতে যাইয়াও মানুষ অনেক সময়েই আপনাকে ভুলিয়া যায়, এবং আপন কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। এই ভয়সঙ্কুল সংসারে ভাল পদার্থ হইতে সময়ে

সময়ে প্রাণ-সংহারক পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া কি লোক সেই পদার্থ পরিত্যাগ করিতে পারে ? ভালবাসা ভিন্ন মানব জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব;—যে মানবের হৃদয় ভালবাসায় অবনত নহে, সে মানব পণ্ডিত বা বিদ্বান হইতে পারেন, কিন্তু এ সংসারে তিনি চিরকাল কঠোর অসুর বলিয়া অভিহিত হইবেন। সে মানব এই সংসারকে কেবল কষ্টের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এই ভালবাসা হইতে সময়ে সময়ে মনুষ্যত্ব-বিনাশক গরল উৎপন্ন হয় বলিয়া কি ইহা অনবলম্বনীয় ? না, তাহা নহে। অগ্নি হইতে সময়ে সময়ে সংসারের অনেক অনিষ্ট সাধিত হয় বলিয়া কি অগ্নির উপকারিতা বিস্মৃত হওয়া এবং উহাকে পরিত্যাগ করা উচিত ? নদীর গর্ভ কত সময়ে কত অর্ণব আরোহী সমেত আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া কি জলের সহিত মানব সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে ? না—তাহা নহে। এরূপ অবস্থায় আমরা বলি, সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকা উচিত। আমার চতুর্দ্দিকের বন্ধুবান্ধবকে, আমার চতুর্দ্দিকস্থ আত্মীয় স্বজন, দূরস্থিত স্বজাতীয়কে এবং বহুদূরস্থিত সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে আমি ভালবাসি কিসের জন্য ? অন্যকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া, কেবল ভালবাসার জন্য ভালবাসি। কেবল ভালবাসার খাতিরে যাঁহারা অন্যকে আপন হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে পারেন, কিম্বা আপনি অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তাঁহারা কখনও ভালবাসায় বিঘ্ন এবং ভালবাসার বিভীষিকা দেখেন না। এ সংসারে যদি সুখ শান্তি থাকে, তবে তাহা তাঁহারাই ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য অল্পে অল্পে অলক্ষিত ভাবে বাহ্যচটক ভালবাসার জাল বিস্তার করিয়া অন্যকে তাহাতে বদ্ধ করেন, কিম্বা অন্যের জালে বদ্ধ হন, তাঁহাদিগের নিকট ভালবাসা ঘোরতর নরক ভোগ। যতক্ষণ তাঁহারা স্বার্থ চরিতার্থ করিতে না পারেন, ততক্ষণ এক অভূতপূর্ব্ব, অচিন্ত্য বন্ধনে তাঁহারা আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন ; এত মুগ্ধ হইয়া যান যে, ইচ্ছা করিয়াও আর সেই ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিতে পারেন না। অলীক স্বপ্ন দেখিলে মানব যেমন উঠিতে চাহিলে উঠিতে পারেনা, মুখ খুলিয়া কথা বলিতে চাহিলে বাক্‌নিষ্ক্রান্ত হয় না, সেই প্রকার তাঁহারাও ইচ্ছা থাকিলেও আর বাহির হইয়া আসিতে পারেন না। সেই ভালবাসার অনুরোধে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা, সকল বিসর্জ্জিত হয়। বাস্তবিক যাঁহারা কখনও এই প্রকার স্বার্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, এই প্রকার ভালবাসার জালে

জড়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, গৌরব, এবং যাহা কিছু উপার্জ্জনের উপযুক্ত, সকলি তাঁহারা অম্লান বদনে বিসর্জ্জন দিয়া বসেন।

ভালবাসার আর এক রাজ্য আছে। এ রাজ্যে মানব স্বার্থের চিন্তায় প্রবেশ করিয়াও এক মহা মায়ায় জড়িত হইয়া পড়ে। ইহার প্রকৃত কারণ, মানব মনের দুর্ব্বলতা। প্রথম যখন মানুষ এই ভালবাসার রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন মনে করে,—বাস্তবিক ইহাতে কৃতার্থ হইব;—যখন চতুর্দ্দিক হইতে সারি সারি লোক এক হাতে স্তুতিবাদ বা তোষামোদের তৈল-পাত্র, অপর হস্তে ভালবাসার পাত্র লইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তখন সাধ্য কি মানবের যে, সেই চিত্রকে প্রলোভনের চিত্র বুঝিয়া দূরে পলায়ন করিবে? যাঁহারা এ প্রকার সময়েও দূরে যাইতে সক্ষম, এ প্রকার ভালবাসার রাজ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহাদের আত্ম রক্ষার ভয় নাই,—তাঁহারাই এ সংসারে মনুষ্য, তাঁহারাই ধার্ম্মিক বা সাধক। কিন্তু সে প্রকার ধার্ম্মিক বা সাধকের অস্তিত্ব সংসারে অতি অল্প। ফাঁদে প্রবেশ করিতে করিতেই মানবের সৎ সাহস চলিয়া যায়, উৎসাহ উদ্যম একেবারে বিনষ্ট হয়, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া যায়;—মুখ থাকিতেও ভাষা বাহির হয় না। এই প্রকারে যাঁহারা ভালবাসার দাসত্বে আপনাদিগের জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহারা সত্য বা ন্যায়ের ধার ধারেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ধার ধারেন না, তাঁহারা কেবল জানেন, মায়াময় ভালবাসা। ভালবাসার সেবা করিতে যাইয়া যাঁহারা এই প্রকার পৃথিবীস্থ সকল উৎকৃষ্ট ভূষণ হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহা-দিগকে সংসারের লোকেরা দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া নিবৃত্ত হয়; আমরা এবম্প্রকার মানবকে জগতের মহা অনিষ্টকারী বলিয়া জানি। সত্য ও ন্যায় তাঁহাদের নিকট অবহেলিত হইয়া হইয়াই আজ পৃথিবীতে আর স্থান পাইতেছে না,—তাঁহাদের নিকট উপেক্ষিত হইয়াই, সত্য ও ন্যায় আর মানবের মনোরাজ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না।

এক দিকে যেমন আমরা এ প্রকার ভালবাসাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আবার অন্যদিকে কেবল ভালবাসার জন্য যে ভালবাসা, তাহাকে হৃদ-য়ের সহিত আলিঙ্গন করি। ভালবাসা চাই মানবের,—নচেৎ মানব হৃদয় পশুর হৃদয়,—পিশাচের হৃদয়। কিন্তু ভালবাসা চাই বলিয়া সত্য ও ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিতে পারি না। যে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই, তাহা কখনও সত্য ও ন্যায় ছাড়া থাকিতে পারে না; সে ভালবাসার মধ্যে সকল

প্রকার নীতি বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু যে ভালবাসায় সত্যের অবমাননা হয়, যে ভালবাসায় মুগ্ধ হইলে সত্য রক্ষার জন্য মানব আর বল পায় না,—ভাষা পায় না—উৎসাহ পায় না,—আমরা সে ভালবাসা চাই না। সত্য ও ন্যায়কে আমরা সকল অপেক্ষা আদরের মনে করি—এই সত্য পালন করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রসর,—তাঁহাদিগের বিপদে ভয় নাই—শত্রুর চিন্তা নাই,—ভালবাসায় স্বার্থ নাই। আমরা যদি এই প্রকার সত্যকে আলিঙ্গন করিতে পারি, সংসারের সকল পরিত্যাগ করিতে পারি, অম্লান বদনে। আমরা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রকার সত্যের আদর করিতে শিক্ষিত হইয়া থাকি, আমরা এ সংসারের কাহাকেও ভয় করি না। সত্য ও নীতির পথে সে ভালবাসা কণ্টক হয়, আমরা সে ভালবাসাকে ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত নহি। এই সত্যের জন্য দেশীয় বন্ধু বান্ধব, সহোদর সহোদরার মনে যখন শেল বিদ্ধ করিতে পারিয়াছি, তখন নিশ্চয় আমরা ব্যক্তি বিশেষের মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিব না। যাঁহারা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য মায়াময় ভালবাসার জালে আবদ্ধ হন, আমরা তাঁহাদিগকে কৃপা-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। সত্যের জন্য জীবন, সত্যের জন্য সকল ; আর যদি মানবের মঙ্গলের পথ থাকে, তাহা এই সত্যের পথ। এই পথে বিচরণ করিবার মানসে যে দিন মানব স্বার্থময় ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, সেই দিন মানব মনের দুর্জ্জয় সাহসের আমরা পরিচয় পাইব, সেই দিন অপ্রাকৃত মানবের দুর্ব্বলতার পরিচয়ে আমরা মলিন হইব না, এবং সেই দিন মানবের মধ্যে এক প্রকার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইব।

জীবনের সহিত মুখ-বিনিঃসৃত বাক্যের সম্বন্ধ।

অন্যান্য দেশের মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিলে আমরা মানব জীবনে যে সকল মহত্ত্ব দেখিতে পাই, বহু চেষ্টাতেও স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে তাহা দেখিতে পাই না। মানুষ এ সংসারে স্রোতের শৈবালের ন্যায় ভাসিয়া অনন্ত কালসমুদ্রে মিশাইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না। জীবনের লক্ষ্য যাঁহারা সুস্থির না করিয়াই কূল-শূন্য সংসার-সমুদ্রে জীবনকে ভাসাইয়াছেন, এবং সামাজিক তরঙ্গাঘাতে একবার

ঊর্দ্ধ, একবার নিম্নস্থ হইয়া অপরিমেয় কর্দ্দমময় জল-রাশি উদরস্থ করিয়া লীলা খেলিতেছেন, তাঁহারাই সংসারে ধন্য কিনা, তাহার মীমাংসাও আমরা করিব না। আমরা যাহা আজ বলিব, তাহা এই, আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা জানেন না, কি করিলে কি হইবে, জীবনের কোন্ পথ অবলম্বন করিলে অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইবে, কোন্ ব্রত গ্রহণ করিলে স্বীয় জীবনের অভাব, জাতির অভাব দূর হইবে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিয়া অগ্রসর হন না। স্রোত চলিতেছে, তাই তাঁহারা চলিতেছেন; আমাদের বিশ্বাস, যখন স্রোত স্থগিত হইয়া যাইবে, তখন আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিবেন না, কিম্বা দৈবঘটনায় যখন পশ্চিমের বহমান স্রোত উত্তরে চলিবে, তখন তাঁহারা আবার সাহ্লাদে উত্তরে ভাসিয়া যাইবেন। এই যে বর্ত্তমান সময়ে কত শত যুবক দেশের কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, ঈশ্বর না করুন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহা-দিগের জীবনের লক্ষ্য সুস্থির না হইলে, তাঁহাদিগের উৎসাহ অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। কত লোকের জীবন যে কথার অনুরূপ হয় নাই, গণনা করা যায় না। মুখের কথা এক বস্তু, জীবনে পরিণতি অন্য বস্তু। মুখের কথা যে স্থানে ফেণায়মান জলবিম্বের ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, সে স্থানের কথার উপকারিতা কিছুই নাই। কথার সহিত যখন জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ঐক্য হয়, যখন মুখের কথায় আর জীবনের কার্য্যে বৈষম্য থাকে না, তখনই মানব বাঞ্ছিত বস্তু লাভে অধিকারী হয়। আমরা জানি, মানচিত্রের অন্যান্য দেশে এমন সকল মহাত্মা আছেন, যাঁহারা অতি অল্প কথা মুখে উচ্চারণ করেন, তাহার কারণ এই, কথার সহিত জীবনের সম্বন্ধ থাকিবে কি না, এই বিষয়ে তাঁহারা অহরহ চিন্তা করেন। তাঁহারা জানেন,—এক জনের কথা, যাহা এক সময়ে বায়ুতে বিলীন হইয়া যাইতে দেখা গেল, তাহাই পরমাণুতে পর-মাণুতে প্রতিঘাত হইয়া বৎসরান্তে কি শতাব্দী অন্তে কত সুফল সাধন করিতে পারে। তোমার আমার জীবনে দেশের কি উপকার করিতে পারি, যদি আমরা কথার এই প্রকার উপকারিতা বিস্মৃত হই। আজ আমরা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সে সকল বাক্য মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুতে মিশাইয়া যাইতেছি, কে বলিতে পারে, ইহা হইতে আর ফল উৎপন্ন হইবে না? লোকে বলে, কথা বায়ুতে মিশায়; কিন্তু তাহা নহে। জীবনের সহিত ঐক্য করিয়া যে কথা বলা যায়, তাহাতেই ফল হয়। তুমি গ্রন্থকার, তুমি বক্তা, আর তুমি হিতৈষী, তোমার

কোন্ কথায় কি প্রকার ফল প্রসব করিতেছে, তাহা যদি তুমি বুঝিতে না পারিয়া থাক, তবে সতর্ক হও; যদি দেশের উপকারের ব্রত গ্রহণ করিয়া থাক, তবে জীবনের সহিত যে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পার নাই, তাহা পরিহার কর; মনে রাখিও, তোমার একটী কথায় তোমার দশবৎসরের পরিশ্রম নিমেষ মধ্যে ভস্ম হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে। এ সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা, আমরা প্রত্যহ ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। লক্ষ্যবিহীন, উদ্দেশ্য-বিহীন হিতৈষী সহস্র সহস্র কথায় তাহার জীবনকে অসার করিয়া ফেলিতেছে, তাহার জীবনের কর্ত্তব্য আর পূর্ণ হইতেছে না। বাক্যের এমনি শক্তি যে, জীবনের কার্য্যের সহিত ঐক্য হইলে একটী বাক্যে সহস্র সুফল উৎপাদন করিতে পারে; আর জীবনের কার্য্যের সহিত ঐক্য না হইলে সকল বিনাশ করিয়া ফেলিতে পারে। সুনীল আকাশে শুকতারা নিরীক্ষণ করিয়া যেমন পথিক পথে বাহির হয়; অকূল সাগরে নক্ষত্র বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেমন কাণ্ডারী নির্ভীক হৃদয়ে পোত চালাইয়া যায়, তাঁহার আর কোন পদার্থে মন থাকে না, যাই চক্ষু ফিরিবে, অমনিই পোত অগম্য পথে যাইবে, এই আশঙ্কা করিতে করিতে যেমন অবিচলিত ভাবে পোত চালাইয়া যায়; সেই প্রকার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া, যে দিন আমাদের দেশের লোক, অবিচলিত ভাবে, সেই লক্ষ্যের দিকে চলিতে থাকিবেন, যখন তাঁহাদের বাক্যের সহিত জীবনের কার্য্যে আর বৈষম্য দৃষ্ট হইবে না, যখন তাঁহারা একবার উর্দ্ধে, একবার নিম্নে, একবার উত্তরে ও একবার দক্ষিণে নীয়মান হইবেন না, সেই দিন বুঝিব, এ দেশে জীবন গঠন হইয়াছে। একটী বাক্য, একটী মহা ঔষধ; পক্ষান্তরে, একটী বাক্য, একটী বিষপোকা। একটী বাক্য সহস্র জীবন পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, একটী বাক্য সহস্র জীবনকে কলুষিতও করিতে পারে। এই মহাসত্যের মর্ম্ম যে দিন আমাদের দেশের প্রত্যেকের হৃদ্বোধ হইবে, সেই দিন দেশের প্রতি আমাদের আশা শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে।

দুইটী অসমঞ্জস চিত্র।

বহু দিবস পূর্ব্বে বান্ধবে হরগৌরীর অসমঞ্জস প্রকৃতির তত্ত্বভেদী মনোহর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা আজ সে প্রবন্ধের সমালোচনা করিবার জন্য চেষ্টা করিব না। আমরাও যখন, কি মানব প্রকৃতি, কি

ভৌতিক জগতের ছবি, ইহার কোনটীর তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, তখন এই প্রকার মিলন দেখিলে বড়ই সুখী হই। এই শোকদগ্ধ সংসারে স্নেহমাখা জননীর এক নয়নে হাসি, অন্য নয়নে ক্রন্দনের জল; প্রেমের পুত্তলি স্ত্রীর ভালবাসার একদিকে স্বার্থত্যাগের মনোহর চিত্র, অপরদিকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণত্যাগ; পুরুষের হৃদয়ের কমল ভাব, এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের কঠোরতা; অল্প মেঘমালায় আচ্ছাদিত জগৎস্নিগ্ধকারী চন্দ্রমার ক্ষীণ অথচ উজ্জ্বল জ্যোতি; একটী কুসুমের অর্দ্ধভাগে কণ্টক অপর ভাগে কোমলতাময় কুসুম-দল; কিম্বা একই পুষ্পে দুই বর্ণ প্রতিফলিত;—প্রকৃতির মনোহর ছবির মধ্যে যখন একদিকে সৌন্দর্য্যের প্রাণমুগ্ধকর গুণ দেখিয়া মোহিত, এবং অপরদিকে ভীষণ বিভীষিকা দেখিয়া কম্পিত-কলেবর হই, তখন বাস্তবিক আমাদিগের হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। এই প্রকার চিত্রে আমরা সুখ বোধ না করিলে, এই দুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে ক্ষণিক সুখের লালসায় আমরা কখনও বাস করিতে পারিতাম না, বিশেষতঃ ইংরাজ প্রকৃতি এবং বাঙ্গালী প্রকৃতির অসমঞ্জস ভাব দেখিয়া, আমরা এত দিন পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বাধ্য হইতাম। পৌষ মাসের দেব-গর্জ্জন যে কারণে আমাদের হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয়, গ্রীষ্মকালের দিবসের পর রজনীর স্নিগ্ধতাতে আমরা যে কারণে অত্যন্ত সুখ বোধ করি, পরিপাটী নদীতে ভীষণ তরঙ্গ দেখিলে যে কারণে আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়.এবং একই সময়ে বৃষ্টি ও রৌদ্র দেখিলে যে কারণে আমরা উল্লাসে হাসিতে থাকি; সেই কারণেই বর্ত্তমান শতাব্দীতে একদিকে নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, অত্যাচারীর ভীষণ ও কঠোর অনুশাসন এবং অপর দিকে কোমলমতি, দুর্ব্বল, নিপীড়িত ও পর-পদ-লুণ্ঠিত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ ও সঙ্কুচিত মূর্ত্তি দেখিয়া সুখ বোধ করিয়া থাকি। কারণ, সুখ বোধ না করিলে কি আমাদের শরীর বর্দ্ধিত এবং মন উন্নত হইত? এ সংসারে যদি কিছু অসম্ভব থাকে, তাহা এই, মনের সুখ ও শান্তি ভিন্ন মানব কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। হয় আমরা অসমঞ্জস চিত্র দেখিয়া সুখ পাইয়া থাকি, না হয় আমরা অনুন্নত। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা যে শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, হইবেন; আমরা কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীতেই অধিক অনুরক্ত। কণ্টকের পাশে পদ্মকে দেখিলে আমাদের মনে হয়, এক সময়ে এই পদ্ম কণ্টকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই সকলের মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বাঙ্গালীর অধীনতার

কষ্ট এবং ইংরাজের স্বাধীনতার সুখ যদি আমাদিগের অসহনীয় হইত, আমরা নিশ্চয় এদেশ পরিত্যাগ করিতাম। আমাদের আশা এই, ঐ কণ্টকাবৃত ইংরাজ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াই কোমল বাঙ্গালী-পদ্মের সৌন্দর্য্য এক দিন জগতের চক্ষুকে আকৃষ্ট করিবে।

আর একটী চিত্র। আমরা বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার দুর্ভিক্ষের সহিত চির সহবাস করিতে বসিয়াছি। গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের সহিত ভারতের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, এমনি ভালবাসা জন্মিয়াছে যে, কখনও এই দুর্ভিক্ষ একেবারে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সন্দেহ। দুর্ভিক্ষ পীড়নে ভারতবাসীদিগের উৎসাহ, উদ্যম, বল, ভরসা, আশা, উদ্যম একেবারে ডুবিয়া যাইতেছে,—সোণার প্রতিমা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে। দিনের পর দিন যাইতেছে, আর ভারতের নিম্নশ্রেণী মলিন হইতেছে! কি বিষাদের চিত্র! যখন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্য নৃশংস পিতা মাতা সন্তানের ভালবাসা ছিন্ন করে, তখন সে চিত্র দেখিলে কাহার মন না দুঃখ ও বিস্ময়ে ডুবিয়া যায়! আবার অন্যদিকে পিতা মাতা যখন সন্তানের কষ্ট নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভালবাসার মধুর বন্ধন ছিন্ন করে, তখন সে চিত্র দেখিলেই বা কাহার হৃদয় না গলিয়া যায়! এ সকল কি অস্বাভাবিক ঘটনা? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে বাস করিয়াও কি আমরা এ সকল চিত্রকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি? আজ আমরা এখানে বসিয়া যতক্ষণ কল্পনা করিতেছি, এই সময়েই কত লোক অনাহারে মরিয়া যাইতেছে,—এই সময়েই কত লোকের ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল কাতর স্বর গগন ভেদ করিয়া আকাশে উঠিতেছে। ঐ যে আহারের সময় আসিল, ঐ যে আহারের সময় আসিল, এই চিন্তা করিয়া কত দরিদ্র ব্যক্তি দিন রাত্রি অশ্রু ফেলিতেছে! কি দুঃখ-উদ্দীপক দৃশ্য! পূর্ব্ববঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে! মান্দ্রাজ বোম্বে একটু সুস্থ হইতে না হইতেই পূর্ব্ব বাঙ্গালা ক্রন্দন-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতেছে। যাঁহাদের হৃদয় পর দুঃখে কাতর, যাঁহারা অন্যের অশ্রু দেখিলে আপন অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা পূর্ব্ব বঙ্গের কষ্টের কথা শুনিয়া নিশ্চয় দুঃখিত হইবেন। এই যে ভয়ানক সময়, এই সময়েও আমরা সুখের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। একদিকে যেমন পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্ভি-ক্ষের হাহাকার ধ্বনি আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অবসন্ন করিতেছে, অপর-দিকে সাগরের পার ইংলণ্ডের মহাসভা হইতে কত শুভ সংবাদ আসিতেছে।

মহামতি গ্লাডোষ্টোন, সুপ্রসিদ্ধ ব্রাইট, ভারতবন্ধু ফসেট প্রভৃতির ভালবাসা ভারতের প্রতি শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাঁহাদিগের চেষ্টা, উদ্যম, ভারতের জন্য স্বার্থত্যাগের কথা স্মরণ করিলে কত সুখ হয়! গ্লাডোষ্টোন কমন্স সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ শুনিয়া কত আশা যুক্ত হইতেছি। ব্রাইট সাহেব জাতি বর্ণ ভুলিয়া উইলিস্ গৃহে ভারতের হিতের জন্য যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কত কল্পনার সুস্বপ্ন দেখিতেছি! *

দেশের সুশিক্ষিত লোকদিগকে আমাদিগের একটী অনুরোধ,—প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আহা অসার। সত্য বটে, রোগের জ্বালা এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে প্রলেপ দেওয়া আশু প্রয়োজন। বিলাতে আবেদন প্রভৃতিকে আমরা প্রলেপবৎ মনে করি। প্রলেপে হয় ত এক স্থানের ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু অন্য স্থানে যে আবার ক্ষত হইতে পারে, সে আশঙ্কা দূর হয় না। বাস্তবিক শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত না হইলে কোন আশা নাই। যাহাতে ভারতবাসীদিগের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, এবং যাহাতে সকলের স্বত্ব,—সকলের রোগ সকলে বুঝিয়া তাহা দূর করিবার জন্য ঔষধ সেবন করিতে পারে, এবং যাহাতে আর প্রলেপের প্রয়োজন থাকে না, তাহার জন্য সকলে চেষ্টিত হউন। দুর্ভিক্ষের মধ্যে ভারতের জীবন রহিয়াছে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে ভারতবাসীর উন্নতির মূল নিহিত আছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন; যাহাতে দুর্ভিক্ষের মধ্যস্থিত জীবন ভারতের সকলে লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করুন। অভাব না বুঝিলে কোন দিন কোন জাতি সেই অভাব দূর করিতে চেষ্টা করে না। দুর্ভিক্ষের মধ্যে যে অভাব এবং তাহা দূর করিবার যে প্রকৃত ঔষধ মানব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে বিলাতেও লোক পাঠাইতে হইবে না, এবং সাহায্যের জন্যও গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হইবে না, যাহাদের রোগ তাহারাই তাহা দূর করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। সকলে যদি ভারতের সকল রোগের ঔষধ যোগাইতে পারেন, তবে ইহার ভাবী ইতিহাসে কেবল মঙ্গলময় চিত্র দেখিতে পাইবেন।

* ব্রাইট ও ফসেট যখন জীবিত ছিলেন, ইহা সেই সময়ের কথা।

মানবের উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং অপকৃষ্ট আভরণ।

মানবের মধ্যে কতকগুলি ভাব কমনীয়, যাহার পরিচয়ে জনসমাজ মুগ্ধ, স্তম্ভিত এবং বিস্মিত। মানবের অন্তরনিহিত কতকগুলি ভাব বিকশিত হইলে, জনসমাজ শ্রদ্ধা, ভক্তি, এবং ভালবাসা লইয়া সেই ভাবগুলিকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়। আবার কতকগুলি ভাব এমনই কঠোর যে, তাহার পরিচয় পাইলে জনসমাজ বিশ্বপ্রেমের আকর্ষণ ভুলিয়া, ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া দূরে গমন করে, এবং অবসর পাইলেও আর সে মানবের সন্নিকটস্থ হয় না; কতকগুলি ভাব এত ভীষণতর যে তাহার পরাক্রমে লোকসমাজ দগ্ধ, প্রপীড়িত, উৎসন্ন এবং অবসন্ন। পৃথিবীর পণ্ডিতেরা প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের ভাবগুলিকে দেবভাব বলিয়া থাকেন এবং শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের ভাবগুলিকে পশুভাব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের বিকশিত ভাবগুলিকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করি।

এই বিশ্ববিস্তৃত স্বার্থ এবং চির-বৈষম্যময় জগৎসংসারে যখন দেখিতে পাই,—লোক অত্যাচারের উপর অত্যাচার অক্লান্ত অন্তরে বহন করিতেছে,—কাহারও চক্ষু উৎপাটিত হইতেছে, কাহারও বা মস্তক বিলুণ্ঠিত; কেহ জরা-জীর্ণ হইয়া জীবনকে শত্রুর হস্তে ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইতেছে, আবার কাহারও সম্মুখে ইচ্ছা এবং আসক্তির বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটাইয়া মনকে তুষের আগুনের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু তবুও তাহারা আপন আপন পথ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখনও স্বজাতির কথা, মানবসমাজের উন্নতির কথা ভুলিয়া যাইতে পারিতেছেন না; তখন বাস্তবিকই আমাদের ইচ্ছা হয়, সেই লোকদিগের পদতলে পড়িয়া চিরকাল তাঁহাদিগের কার্য্য সমূহের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

আবার আমরা যখন এই ঐন্দ্রজালিকভাবে প্রমুগ্ধ সংসারে দেখি, কত মানবজীবন কেবল পরের ভাবনা ভাবিয়াই শেষ হইয়া যাইতেছে, কত জীবন পরের অশ্রু মুছাইতে, পরদুঃখাপসরণে, পর উন্নতির চেষ্টাতেই শেষ হইয়া যাইতেছে, তখন আমরা মানবের অলৌকিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ, স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হই। এ সংসারে সকল শিক্ষার মূল শিক্ষা পরের ভাবনা, এ সংসারে সকল বিদ্যার উচ্চ বিদ্যা পরের হৃদয় অধ্যয়ন, এ সংসারে সকল ধর্ম্মের

মূল পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। আমরা যখন এই অহঙ্কারময় সংসারে আন্দোলন-শূন্য নীরব জীবন কাহিনী শুনিতে যাইয়া এই প্রকার শিক্ষিত, এই প্রকার বিদ্বান এবং এই প্রকার ধার্ম্মিকের কথা শুনিতে পাই, তখন আমাদের নয়ন হইতে শতধারে আনন্দাশ্রু নিপতিত হয়, ইচ্ছা হয়, সেই প্রকার জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হই। এই প্রকার (সাধকই বল যাহাই বল) উন্নত জীবনের অস্তিত্ব কি অস্বাভাবিক ? যাঁহারা আজীবন অন্ধ, তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও দৃষ্টিহীন, (এ প্রকার অন্ধতা, অহঙ্কার এবং আত্মাভিমান হইতে উৎপন্ন হয়), তাঁহাদের নিকট নিশ্চয় এ প্রকার জীবনের কথা আশ্চর্য্যের বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাহারা এ সংসারে আপনার মহত্ত্ব কিম্বা সৌন্দর্য্য চিন্তাতেই নিমগ্ন, যাহারা দিবসের মধ্যে দশবার আপনার মুখশ্রী দেখিয়া বিমোহিত হয়, এবং আর দশবার আপন প্রশংসা অন্য মুখে শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে, নিশ্চয় তাহাদের নিকট এ প্রকার জীবন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। আপনার ভাবনা ভাবিতেই তাহাদিগের জীবনের সকল সময় অতীত হয়, কখন আর তাহারা মানবের অন্তরনিহিত ভাবরাশি পরীক্ষা করিয়া আপন জীবনকে সেই ভাবরাশি দ্বারা পরিশোভিত করিতে ইচ্ছান্বিত হইবে ? তাহাদের নিকট সমস্ত সংসার থাকিয়াও যেন নাই, উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়াও তাঁহারা জগতের চিরান্ধকারে বিচরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা আসক্তি-শূন্য, এবং যাঁহারা এসংসারের সরল শিক্ষার্থী, তাঁহারা একদিকে যেমন জড় জগতের মনোহারিণী সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, সেই প্রকার মানব হৃদয়ের স্তর হইতে স্তরান্তরে, অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়া এক আশ্চর্য্য সুন্দর রাজ্য নিরীক্ষণ করিয়া এ সংসারের সকল ভুলিয়াও সুখ অনুভব করেন। বাস্তবিক মনোরাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যে কেবল তাঁহারাই মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত। তাঁহাদের নিকট আমাদিগের কথা সকল কখনও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে না। বরং তাহারা যদি নির্ব্বাক না হইয়া ভাষায় মানবের মনোরাজ্যের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতেন, তবে আমরাই তাঁহাদিগের বর্ণিত ভাবকে অস্বাভাবিক বলিতে পারিতাম ; কারণ এ সংসারের ভাবুক শ্রেণী নীরব, তাঁহারা আপনারাই আপনাদের সুখে নিমজ্জিত থাকেন, ভাষা তাহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহারা সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন না। তবুও সময়ে সময়ে অপরিস্ফুট ভাষায় তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করি, তাহাতেই আমরা বিস্মিত হই।

বাস্তবিক মানবের মধ্যে যে সকল ভাব সাধন সাপেক্ষ, তাহাই মনুষ্যত্ব এবং সেই সকল ভাব বিকশিত হইলেই অন্যের পূজা পাইবার উপযোগী হয়।

আবার অন্যদিকে মানবের মধ্যে কতকগুলি কঠোর ভাব আছে,—যাহার পরিচয়ে সংসার কম্পিত এবং বিলোড়িত। কপটতা-আচ্ছাদিত মানবের মধ্যে কত প্রকার ভাব নিমেষে নিমেষে উদিত হইয়া তাহাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ আত্মীয় স্বজনকে অস্থির করিয়া থাকে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই জগৎ একটী আশ্চর্য্য ক্রীড়াভূমি, এই রঙ্গভূমিতে যাঁহারা কপটতার আচ্ছাদন খুলিয়া অন্যের হৃদয়ের ভাবভঙ্গি দেখিতে সক্ষম, তাঁহারাই মানবের নানা প্রকার কদর্য্য ভাব দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হন, এবং কি দেখিলাম, কি দেখিলাম, এই প্রকার ধ্বনিতে সংসারকে সেই সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত করেন। মানবের মত যাদুকর এই ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় জীব পরিদৃষ্ট হয় না। মানব সমাজে আবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, শরীরের ন্যায়, মনের চতুর্দ্দিকেও যে স্তরে স্তরে কত আভরণ দ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া রাখে, তাহা বুঝিতে পারিলে এবং প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, সকলকেই বিস্মিত এবং চমকিত হইতে হয়। মানুষ আবার মানুষকে উন্মত্ত বলিয়া সম্বোধন করে; মানুষ আবার মানুষকে পাগল বলিয়া অভিহিত করে। পাগলের দোষ এই যে, তাহারা সরল,—যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া ফেলে; মনের ভাব গোপনে রাখিতে পারে না। মানুষও যদি কপটতার আভরণ ছিন্ন করিয়া মনের সকল ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত, তবে নিশ্চয় সকল মানুষকেই উন্মত্ত বলিয়া বোধ হইত। এই পৃথিবীময় পাগলের বাস, এ কথা কেহই অস্বীকার করিত না। পাগলের সরলতাকে প্রশংসা কর বা না কর, সে এক কথা; কিন্তু যাহাকে পাগল বলিয়া স্বীকার কর না, তাহার কপটতাকে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রশংসা করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়? মনুষ্যের মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে, যাহাতে তাহাকে অন্য প্রকার জীব বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে তাহা এই কপটতা;—এই কপটতা না থাকিলে তুমি, আমি, জগৎ সংসারের সকলেই পাগল। প্রত্যেকের মনের মধ্যে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখত, কোন্ মানবের মন কত জঘন্য! দেখ, কাহার মনে কি প্রকার পাপাগরল পোষিত হইতেছে। হায়, এই পৃথিবীতে কপটতাও উৎকৃষ্ট ভূষণের মধ্যে পরিগণিত হইল!!

এই শক্তিময় জগৎসংসারে ইহা আশা করা যায় না যে, সকল মানব আপন আপন বৃত্তি এবং রিপুকে আবশ্যক মত পরিচালিত করিয়া আজ্ঞাধীন রাখিবে। কি নিয়মে সংঘটিত হয়, তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু ইহা ঠিক যে, মানবের পরমবন্ধু রিপুগণ, এবং মনুষ্যত্বের প্রকৃত লক্ষণ বৃত্তিগণের নানাপ্রকার ভীষণ ভাবে সময়ে সময়ে মানবকে অস্থির করিয়া থাকে। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি বৃত্তির অপকৃষ্ট ফল সকল যদি মানবের আত্মাকে মলিন না করিত, তাহা হইলে কে না স্বীকার করিবেন যে, মানব পৃথিবীতে বিমল সুখের অধিকারী হইত? আবার অন্য দিকে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির উত্তেজিত শক্তি যদি মানবকে অস্থির না করিত, তবে কে অস্বীকার করিবেন যে, মানবই এ সংসারে দেবতা বলিয়া অভিহিত হইত? কিন্তু ইচ্ছা কি প্রবৃত্তির অধীন? কিন্তু মানবের শক্তি কি সকলের জ্ঞানাধীন? যদি তাহা হইত, তবে আর আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের অবতারণার আবশ্যকতা থাকিত না। যাহারা প্রকৃতির উপাসক, যাহারা পৃথিবীর সকল পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং তত্ত্ব লইয়াই পড়িয়া রহিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সময়ে সময়ে তাহারাও শক্তির অপব্যবহারে এত ভীত বা বিরক্ত হইয়া পড়েন যে, আর অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির মধ্যেও নানাপ্রকার ভীষণ ভাব রহিয়াছে। জানি না, সেই সকল বিশ্বনিয়ন্তার আপন মহত্ত্ব বিস্তারের চিত্র কি না, কিন্তু সেই প্রকার চিত্র দেখিলে ক্ষুদ্রমনা মানব স্তম্ভিত, ভীত এবং বিলোড়িত হইয়া যায়। যখন পৃথিবী-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভীষণতর অগ্নিশিখা প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, লক্ লক্ ধক্ ধকে যখন সংসারকে ভস্মীভূত করিয়া আকাশকে স্পর্শ করিবার জন্য ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, এবং সেই আশঙ্কাতেই বল, যাহাই বল, যখন গ্রাম, নগর, বহু বিস্তৃত প্রান্তর সকল কম্পিত হইতে হইতে ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে থাকে; প্রকৃতির উপাসকেরা যতই অটল হউন না কেন, সে সময়ে আর তাঁহাদের মন ঠিক থাকে না। সিসিলীর দুর্দ্দশা কোন্ উপাসকের মনকে না ব্যথিত এবং বিলোড়িত করিয়াছিল? আবার অন্যদিক চাহিয়া দেখ;—কোথাও কিছু নাই—আকাশ পরিষ্কার ছিল, সেই আকাশে ক্রমে ক্রমে মেঘ সঞ্চিত হইল, দেখিতে দেখিতে বায়ু প্রবলতর হইয়া উঠিল,—তার পর? ঝড়, বন্যা আসিয়া পৃথিবীকে ডুবাইতে বসিল। লোক স্রোতে

ভাসিয়া চলিল, হাহাকারে দিক পূর্ণ হইল! কোন্ প্রকৃতির উপাসক পূর্ব্ববঙ্গের অস্বাভাবিক জলপ্লাবনের সময় স্তম্ভিত না হইয়াছেন? জড় জগতে শক্তির যে প্রকার অপব্যবহার, মানব মনেও সেই প্রকার; কিন্তু কে উহার গতিকে থামাইয়া রাখিতে সক্ষম? মনুষ্য যখন এই প্রকার শক্তির পরাক্রমের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাহার ইচ্ছা বা আসক্তি সকল ডুবিয়া যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই মানবের হস্তে আবার ক্ষমতা ন্যস্ত হয়! দুর্ভাগ্য বশতঃ এই মানব আবার অন্যকে শাসন করিবার ভার গ্রহণ করে! মানবের ক্ষমতার অপব্যবহারে এই ভারগ্রস্ত সংসার কম্পিত-কলেবর ধারণ করিয়াছে। ভৃত্য প্রভুর ভয়ে কম্পিত, স্ত্রী স্বামীর ভয়ে সশঙ্কিতা,* শিষ্য গুরুর ভয়ে অস্থির, প্রজা রাজার ভয়ে বিমর্ষ, কৃষক জমীদারের ভয়ে বিষণ্ণ, নির্ধন ধনীর ভয়ে ব্যাকুল। কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য!! ভুবঙ্ক কেন আজ সশঙ্কিত? আমীর কেন আজ চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছেন? বাঙ্গালার কৃষকেরা কেন আজ মলিন? ভারতের শিক্ষিতসম্প্রদায় কেন আজ অন্যায় শাসনে ব্যথিত? ভারতের মিত্ররাজ্য সকল কেন আজ কম্পিত-কলেবর? ভারতের লেখকের লেখনী কেন আজ নিশ্চল এবং অবসন্ন? এক কথায়, ভারত কেন আজ অস্থির? যদি প্রকৃত মনুষ্য-তত্ত্বজ্ঞ থাকেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন—মনুষ্যের ক্ষমতার অপব্যবহারের ভয়ে। বঙ্গদেশের কৃষক দিবারাত্রি জমিদারের ভাবনা চিন্তায় অস্থির;—কণ্ঠ শুষ্ক, মুখে কথা সরে না। * * * আবার ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসও এই প্রকার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এই মানুষই আবার ঈশ্বরের সমতুল্য বলিয়া অভিহিত হইতে চায়! হা, ঈশ্বর!!

মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পিত এবং সশঙ্কিত, এই সকল বিষয় যখন ভাবি, তখন আর ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হয় না, দিন রাত্রি বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে বাসনা হয়।

নীরব অভিনয়।

এক শ্রেণীর লোক বাহ্য জগতের চাকচিক্যময় আড়ম্বর এবং জাঁকজমক লইয়া থাকিতেই ভালবাসেন। তাঁহারা ভাষার উচ্চ শাব্দিকতাকে অভিনয়ের

* বঙ্গদেশের অন্ততঃ

উৎকৃষ্ট ভাব মনে করেন, এবং অভিনেতাদিগের কুৎসিত অঙ্গসঞ্চালন ও নানা প্রকার বীভৎস রূপ ধারণকে অভিনয়ের জীবন মনে করেন। তাঁহারা মানবের অন্তর রাজ্যের দুর্নিরীক্ষ্য ইতিহাসের কাহিনী পাঠ করিয়া কখনও সুখ বোধ করেন না; কিম্বা মানবতত্ত্বের নিগূঢ় অন্ত্র ভেদ করিয়া কখনও বিমল শোভার অলৌকিক রাজ্য সন্দর্শন করিয়া সুখ ও তৃপ্তি লাভে ইচ্ছুক হন্ না। এই শ্রেণীর লোকেরা নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রজনীতে অভিনয় গৃহে লোকারণ্য সৃজন করে, এবং দিবসে সংসারের নিকট বিদায় লইয়া, আপনার চক্ষুকে আপনি আবরিত কবিয়া রাখে। সংসারের লোকেরা এই শ্রেণীর লোকদিগকে দর্শক বা রসিক বলিয়া অভিহিত করে; এবং যাহারা বাতুলের ন্যায় অভিনয় মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকার অস্বাভাবিক শব্দ কিম্বা অঙ্গ চালনা দ্বারা লোকসমাজকে হাস্যাস্পদ করিতে একটুও সঙ্কুচিত হয় না, তাহাদিগকে অভিনেতা বলে, ও তাহাদিগেব কুৎসিত শব্দ এবং অঙ্গ সঞ্চালনকে নাকি অভিনয় বলে। আমরা এ প্রকার অভিনয়কে পিশাচের নৃত্য কিম্বা বাতুলের ক্রীড়া বলিয়া উপেক্ষা করি বা না করি, সে এক কথা, কিন্তু এ প্রকার অভিনয়কে প্রকৃত অভিনয় বলিয়া কখনও কৃতার্থ হই না।

তবে কি আমরা অভিনয়ের পক্ষপাতী নহি? অভিনয় ভিন্ন মানবের অস্তিত্ব আর কি! আমরা যখন বিশ্বনিয়ন্তার সৃজিত বিশ্বসংসার পানে তাকাই,—ক্ষণকাল একাগ্রচিত্তে যখন বাহ্যজগতের শোভা সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তি-কলাপকে এক এক করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করি; যখন বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং অন্তর ইন্দ্রিয়ের দুর্ভেদ্য দ্বার মুক্ত করিয়া নিবিষ্ট মনে মানবের অন্তর অধ্যয়ন করি; যখন দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার বিলাপধ্বনি এবং একই সময়ে সুখ ও শান্তির উল্লাসের অট্টহাসি শ্রবণ করি, এবং জড় জগতের নানা প্রকার আশ্চর্য্য শোভা সৌন্দর্য্য দেখি,—তখন এই বিশ্বকেই আমরা অভিনয়ের রঙ্গভূমি মনে করি। ঈশ্বরের এই রঙ্গভূমিতে সকলেই অভিনয় করিয়া থাকেন। এখানে ইতর ও উচ্চ শ্রেণীতে বৈষম্য নাই,—এখানে সকলের অধিকার সমান। কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ দুঃখের মর্ম্মভেদী স্বরে অন্যকে ব্যথিত করে, কেহ বা উল্লাসের ভাবে সকলকে বিমোহিত করে; এখানে সকলেই যশ মান সঞ্চয়ে সমর্থ, এবং ইচ্ছানুসারে সকলেই স্বার্থ চরিতার্থ করিয়া 'কৃতার্থ হয়। ভাবুক যিনি—যাঁহার যশের

সহিত, মানের সহিত চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জিত হয় নাই;—যাঁহার ধনের সহিত, এবং বাহ্য জগতের চাক্‌চিক্যময় বিলাসের সহিত প্রতিভা হীনপ্রভ হয় নাই ; তিনিই এই সকল অভিনয় দেখিয়া মোহিত হন ও তিনিই অভিনয়ের যথার্থ সুখানুভব করেন। এই রঙ্গভূমিতে সকলেই অভিনেতা, ইহা বুঝিয়া তিনি হাসি কান্না, সুখ দুঃখ সকল ভুলিয়া ঈশ্বরের ভাবে বিমোহিত হইয়া যান।

অভিনয়ের আর একটী রাজ্য আছে, তাহা অতীব মনোহর, এবং তাহাই যথার্থ সুখপ্রদ। সেই অভিনয়ের ছায়া জগৎ সংসারে পতিত হইয়াছে বলিয়াই, দুঃখের ভীষণ আক্রমণের সময়েও লোক বিশ্বপতির রঙ্গভূমির অন্ত অভিনেতাদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে। আমরা যে অভিনয়ের কথা বলিতেছি, তাহা নীরব অভিনয়। এ অভিনয়ের রাজ্যে শব্দ নাই, ভাষা নাই, আড়ম্বর নাই,লোকারণ্য নাই, বাহ্য সৌন্দর্য্য নাই,প্রকৃতির কৃত্রিমতা নাই;—অভিনয়ের এ এক আশ্চর্য্য রাজ্য। এ স্থানে মানব শব্দ করিয়া অন্য মানবকে আকৃষ্ট করে না, এস্থানে ইন্দ্রিয় সুখের প্রত্যাশী হইয়া, কিম্বা বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে দর্শকবৃন্দ সমবেত হয় না। সংসারের অর্থের সহিত এস্থানের অভিনয়ের সম্বন্ধ নাই,—এস্থানের দর্শকশ্রেণী নির্ধন হইয়াও ধনী, অভিনেতৃগণ পৃথিবীর সকল সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াও এক বিপুল সম্পদের অধিকারী। পৃথিবীর ইতিহাসে এই শ্রেণীর অভিনেতাদিগের সম্পদের বর্ণনা দৃষ্ট হয় না;—বিদ্যার মহামণ্ডপে ইহার কাহিনী পাঠ ও তত্ত্ব লাভ করা যায় না। ধনে এই সম্পদ কেহ ক্রয় করিতে সমর্থ নহে ; যশ মানের উচ্চ সিংহাসনে বসিলেই কেহ এস্থানের সম্পদ ভোগ করিতে পারে না। এই আশ্চর্য্য নীরব অভিনয়ের চিত্র প্রত্যেক মানবের অন্তরে নিহিত থাকিলেও, তাহা নানা প্রকার মলিনতায় আবৃত রহিয়াছে। এই অভিনয়, নীরব ধর্ম্মসাধন। এস্থানের অভিনেতারা যে সম্পদের অধিকারী,—সে বিপুল সম্পদ বিশ্বের অধিপতি পরমেশ্বর। ধর্ম্মপিপাসু সরল বিশ্বাসী যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া দুর্ভেদ্য ও দুর্নিরীক্ষ্য মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করেন, তখন সংসারের সকল আড়ম্বর নিবিয়া যায় ; কিন্তু আর এক আশ্চর্য্য নীরব রাজ্য জ্ঞাননেত্রে পরিস্ফুট হয়। এ রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য অপরিস্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হয় না ;—লেখনি সে অভিনয়ের বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে। ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব রাজ্যে যাঁহারা সরল বিশ্বাসী হইয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই নীরব হইয়া গিয়াছেন :—তাঁহারাই নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছেন। এ

চিত্রের সৌন্দর্য্য, সংসারের কোন সুচিত্রকর আঁকিয়া দেখাইতে পারে না ;—কোন সুবক্তা বাক্যাড়ম্বর করিয়া অন্যকে বুঝাইতে পারে না। বক্তা এস্থানে প্রবেশ করিলে, ভাষার দ্বার রুদ্ধ হয় ; চিত্রকর এস্থানে প্রবেশ করিলে তাহার তুলিকা নিশ্চল হয়। লেখকের লেখনী এস্থানে পরাস্ত হয়, কবির কবিত্ব এস্থানে পরাভব মানে। নীরব আড়ম্বর-শূন্য ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের ভাবে ডুবিয়া যান, তাঁহারাই এ সুখের অধিকারী ; যশ, মান, স্বার্থ, অহঙ্কার, আত্মাভিমান, পাপ-চিন্তা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হন, তাঁহারাই এ অভিনয় দেখিবার অধিকারী।

এ সংসারে মৃত কে?

যাঁহার জীবনে মহত্ত্ব আছে, স্বদেশের উন্নতির আশায় যিনি অম্লান বদনে শত সহস্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, মৃত-শয্যায় শয়ন করিয়াও যিনি অন্যের চক্ষের জল মুছাইতে ব্যাকুল, পরিবর্ত্তনশীল সংসার, পরমাণুর রূপান্তর করিয়া, স্বীয় বলে এমন হিতৈষীর শরীরকে লুক্কায়িত করিতে পারে, তাহা আমরা আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সংঘটন করিতে কখনই সমর্থ নহে। সময়ের আবর্ত্তনে পৃথিবীর অধি-কাংশ জীবের অস্তিত্ব অসময়ে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা জানি। মানবের হিংসা-প্রদীপ্ত ক্ষমতা, পশুভাব জগতে বিঘোষিত করিবার ছলনায়, কত জীবের প্রাণ সংহার করিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? কিন্তু লোকের পতন, লোকের মৃত্যু নহে। সংসারে এমন অনেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বহুকাল হইল, বাধ্য হইয়া সময়-গহ্বরে আপন আত্মাকে লুকায়িত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অদ্যাবধিও অন্য হৃদয়ে সজীবের ন্যায় নিত্য বিহার করিতেছেন। এ সংসারে তাহারাই মৃত, যাহারা আপন শিক্ষায়, আপন চেষ্টায়, আপন দৃষ্টান্তে অন্যের হৃদয় ও মনে আপন মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম। পৃথিবীতে তাহারা জীবনধারণ করিয়াও মৃত। আবার অন্যদিকে যাঁহার নাম স্মরণে অন্যের হৃদয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যাঁহার কথা মনে ভাবিলে সংসারে মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, তাঁহার শরীর ও প্রাণ এ সংসারে থাকুক বা

না থাকুক,—পৃথিবীর চক্ষে সে মৃত হইলেও প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে সে কখনও মৃত নহে। আমরা এই যে মৃত্যুময় প্রকৃতির কত পরিবর্ত্তন দেখিয়া দিন দিন নিরাশ হইতেছি, আমাদের মধ্যে যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও সেই প্রকার জীবনগত মহত্ত্ব থাকে, তবে তাঁহার অসাময়িক পতন যতই দুঃখ-উদ্দীপক হউক না কেন, অনন্ত কাল তাঁহার নাম জগতে বিঘোষিত হইবেই হইবে। এ আশা যদি হৃদয়ে বলবতী না থাকিত, তবে, আমরা পরিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে একেবারে ডুবিয়া যাইতাম ; এ আশা যদি আমাদের হৃদয়কে আশ্বাসিত না করিত, তবে আমরা নিশ্চয় ভাবী উন্নতির আশায় আজ জলাঞ্জলি দিতাম।

আজ আমরা এ সকল কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেন ? তাহার কারণ এই,—আমরা সংসারের লোক, একটু তরঙ্গ দেখিলেই ভয়ে কাঁপিয়া যাই, মনে কত নিরাশা উপস্থিত হয়। আমরা সংসারের লোক, কাহাকে মরিতে দেখিলেই মন দুঃখে আচ্ছন্ন হয়। আমরা ইতিহাসে অধ্যয়ন করিয়া যতই মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করি না কেন, মন কিছুতেই শান্ত হয় না। * * * * সংসারে অনেক লোক জন্মিয়াছে, অনেক লোক মরিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত কীর্ত্তিবান লোক মরেন নাই ; তাঁহাদিগের কীর্ত্তি জীবিত রহিয়াছে। জগতের প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তিরা মরেন নাই। দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদকারী উইলবারফোর্স, সুবিখ্যাত পরহিতৈষী হাওয়ার্ড, কুষ্ঠ-রোগগ্রস্তদিগের পরম বন্ধু ফাদার দামিয়েন প্রভৃতির মৃত্যুতেও জীবন্ত ভাব বর্ত্তমান। পৃথিবীতে ধর্ম্ম-ব্রত রক্ষার্থ যে সকল মহাপুরুষ প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহারা এবং বীরবর নেপোলিয়ান মরিয়াও জীবিত রহিয়াছেন। ডিউক অব ওয়েলিংটন এ সংসারে যদি না থাকিবেন, তবে তাহার কথা স্মরণ করিয়া ইংলণ্ড আজ বীরমদে মত্ত হয় কেন ? ম্যাট্সিনি যদি মরিয়াই চিরজীবনের মত ইহ-লোক হইতে বিদায় লইয়া থাকিবেন, তবে আর ইটালীর নরনারী তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আজ উৎসাহিত কেন ? আমরা জানি, রবার্ট এমেট-প্রমুখ শত শত আইরিস দেশ-হিতৈষী, স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি বৈদেশিক শাসন-দণ্ডে অসময়ে জীবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু রবার্ট এমেট কি আয়র্লণ্ড-বাসীদিগের স্মৃতিতে অদ্যাবধিও জীবিত থাকেন নাই ? তবে মৃত কে ? জীবিতাবস্থায় যিনি মৃতের ন্যায় ব্যবহার করেন, জীবনান্তে প্রকৃত রূপে তিনিই মৃত। এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুতে আক্ষেপের কোন কারণ

থাকে না। যিনি জীবদ্দশায় প্রকৃত মহত্ত্বপূর্ণ জীবিতের ন্যায় কার্য্য করেন, মৃত্যুতেও তাঁহার জীবনের শেষ হয় না। তাঁহার জীবন অন্যের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে।

রাজ-শাসনের ভয়ানক আক্রমণের হাতে পড়িয়া আমাদিগের দেশের বহু লোক অসময়ে মরিয়া যাইতে পারে, কারণ যাহা মনুষ্যের কার্য্য, তাহা পক্ষ-পাত শূন্য নহে; কিন্তু তাহাদিগের জীবনের মহত্ত্ব কখনও স্বদেশীর হৃদয় হইতে বিধৌত হইবে না। মানবের স্মৃতি মানবের এক অলৌকিক সম্পত্তি; এই সম্পত্তি আছে বলিয়াই ইটালী পূর্ব্ব মহাত্মাদিগের নাম স্মরণে আবার সজীব হইয়া উঠিতেছে;—ফ্রান্স আবার ক্ষত দেহে অবিচলিত ভাবে অবিরাম প্রলেপ দিতেছে। মানবের স্মৃতি, মানবের এক মহাবল; কারণ উহা ভিন্ন মানব অতীত সময়ের মহত্ত্ব স্মরণে, ক্ষীণ শরীরে, দুর্ব্বল মনে বল পায় না, উৎসাহ পায় না। ভারতবর্ষের স্মৃতি আছে বলিয়াই ভারত আজও রহিয়াছে; নচেৎ উহা মরুভূমি হইয়া যাইত। ভারতে স্মৃতির পূজা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই, আমরা ইহার ভাবী ইতিহাসে অনেক মঙ্গল নিহিত দেখিতে পাইতেছি। স্মৃতি ভিন্ন মৃত ব্যক্তি আর পরবর্ত্তী মানবের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে না; স্মৃতি ভিন্ন মৃত ব্যক্তি অন্য জীবনে ক্রীড়া করিতে পারে না। আমরা এই স্মৃতির উপাসক হইয়া অবিচলিত ভাবে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ভাবী উন্নতির পথ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। অন্যায় শাসনে বারম্বার নিষ্পেষিত হইলেও আমাদের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।

ন্যায়ের সূক্ষ্ম পথ।

মানব জীবনের যাহা কিছু সুখকর, তৃপ্তিজনক, এবং শান্তিপ্রদ, তাহাই সাধন সাপেক্ষ। সাধনার পথে বিচরণ না করিয়া কেহই আপন অভীষ্ট সিদ্ধির স্থানে পৌছিতে পারেন না। রাজনীতির দুর্জ্ঞেয় এবং জটিল কৌশলের ভিতরে যে সকল গূঢ়তত্ত্ব রহিয়াছে, কাহার সাধ্য, সাধনার পথে বিচরণ না করিয়া সে সকল গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? আবার যাহা কিছু সাধন-সাপেক্ষ, তাহাই সময় সাপেক্ষ,—ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ভিন্ন সে সময় কর্ত্তন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। কি ধর্ম্মনীতি বিভাগ, কি রাজনীতি বিভাগ, সকল

বিভাগই সাধনার বশীভূত,—সকল বিভাগই সাধনার আয়ত্ত। এই পথ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্য পথে বিচরণ করেন, এই ভ্রমসঙ্কুল সংসারে আজ তাঁহারা ধার্ম্মিক বা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু নিশ্চয় এক সময়ে, জগতের চক্ষু যখন প্রস্ফুটিত হইবে, তখন সকলই বৃথা আড়ম্বর ও জাঁকজমক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পৃথিবীর ইতিহাস ভূয়ঃ ভূয়ঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথার প্রমাণ দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাঁহারা ইতিহাস অধ্যয়নে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কথা প্রমাণ-শূন্য বোধ হইবে না।

ধর্ম্মবিভাগে যাহা কিছু সাধনার আয়ত্ত, তাহার মধ্যে ন্যায়ের পথ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম এবং কঠোর। সাধকশ্রেণী ধর্ম্মের আর সকল অংশে জয়লাভ করিয়া, এই স্থানে আসিয়া স্তম্ভিত এবং ভীত হন। যাঁহাদের বিবেক অত্যন্ত সমুজ্জ্বল ও বিবেচনা শক্তি তীক্ষ্ণ, তাঁহারা ভীত হইয়াও পথ পরিত্যাগ করেন না, কারণ বিবেক, ন্যায় ভিন্ন থাকিতে পারে না।

এই স্থানে আসিয়া তাঁহারা কঠোর হন, ধর্ম্মের কোমল ভাবকে দূরে নিক্ষেপ করেন। ন্যায়ের রাজ্যে কেবল কঠোরতা বিদ্যমান। যাঁহারা ন্যায়ের সাধক, তাঁহাদের জীবন কঠোর, ভীষণ এবং ভয়সঙ্কুল। এই সাধক শ্রেণীর অস্তিত্ব এই সংসারে আছে বলিয়াই, পৃথিবী অত্যাচার, পাপ তাপে পরিপূর্ণ হইয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সাধক শ্রেণীর নাম এইক্ষণ পর্য্যন্তও মানব মনে ভয় সঞ্চার করিতে সক্ষম বলিয়াই, আজও মানবের অন্তরে পাপের প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল প্রকার সাধক অপেক্ষা আমরা ন্যায়ের সাধককে উচ্চ স্থানে দেখিয়া থাকি।

দুর্ব্বলচিত্ত মানব, সংসারে থাকিয়া যত প্রকার যুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হউক না কেন, এই ন্যায়ের পথে জয় লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এখানে মানবের ভালবাসা সময় সময় বিসর্জ্জন দিতে হয়, এ পথে কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানবের মুখশ্রী ভুলিয়া যাইতে হয়। আপন পর, এ পথে সমান জ্ঞান; বন্ধু এবং শত্রু এ পথে এক হইয়া যায়। এ পথে মিত্রকে শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে হয়; শত্রুকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন দিতে হয়। মোট কথা, এ পথের লক্ষ্য কেবল বিবেকের অনুরোধ পালন,—এ পথের সার সম্বল কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি। এই সংসারে যাঁহারা এ পথে অটল থাকিতে পারেন, তাঁহাদের পদ আর কোথাও স্খলিত হইতে পারে না;

যাহারা এই পথে জয়লাভ করিতে পারেন ; সংসারের সকল প্রকার যুদ্ধে জয় লাভ তাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে।

কে বলে মানবের অস্তিত্ব স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়াবৎ ক্ষণস্থায়ী ? কে বলে মানব জীবন দুর্ব্বলতার আধার ? যিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁহার জীবনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অমরা আর এ কথা বলিতে পারি না। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অস্তিত্ব অচিন্ত্য কাল স্থায়ী,—সময়ের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন এ প্রকার মানবের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারে না। মানবের মুখে মুখে,—বিবেকের অপরিস্ফুট স্বরে স্বরে এ প্রকার মানবের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়া যায়। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির শরীর দুর্ব্বল হইলে হইতে পারে, কিন্তু চিরকাল তাঁহার অন্তরদর্শী নয়নের প্রতি চাহিয়া দুর্দ্ধর্ষ মানব বলহীনতা স্বীকার করে ; নিশ্চয় সকল প্রকার পাশব বল এ প্রকার বীরের নিকট পরাস্থ স্বীকার করে। এ সংসারে যদি কোন সুখকর স্থান থাকে,যাহার অবলম্বনে দুর্ব্বল মানব সবল হয়, তবে সে স্থান ন্যায়ের পথ। এই পথে বিচরণ করিতে করিতে যখন সাধক আপন আসন স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তখন এ সংসার তাঁহার নিকট কেবল সুখের বলিয়া বোধ হয়। এ স্থানের বায়ু এত পরিষ্কৃত যে, সংসারের পক্ষপাতিতা এবং নানা প্রকার অন্যায়ের অপকৃষ্ট আভরণ সে বায়ু স্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। যদি আমাদিগের দেশের কোন সম্প্রদায় ধর্ম্মের সাধক হইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে সকল ছাড়িয়া এই কঠোরতর সাধনার পথে উপস্থিত হউন;—যদি জীবনের মঙ্গল এবং স্বদেশের উন্নতির অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে নীরবে শত্রুকে মিত্র জ্ঞান এবং মিত্রকে সময় হইলে শত্রু মনে করিয়া ন্যায়ের পথের সাধক হউন। তাঁহাদিগের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ; আর বৃথা আড়ম্বর-অন্ধকারে বিচরণ করিতে হইবে না।

বাঙ্গালীর জীবন এত অনুন্নত কেন ?

পূর্ব্বের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে, বহির্দৃষ্টিতে ইহা বোধ হয় যে, বাঙ্গালীর জীবন ক্রমশঃই উন্নতির সোপানে উঠিতেছে। বাহিরের আড়ম্বরই যদি মানব জীবনের প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমরাও

এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালী অঙ্গ দোলাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে শিখিয়াছে, এ কথা কোন ক্রমেই আমাদিগের অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সামান্য পল্লিগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড নগর পর্য্যন্ত এ কথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাহির ছাড়িয়া অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করিলে কিন্তু অন্য ছবি দেখা যায়। সামান্য একটী গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলে, ইহা সহজেই অনুভব করা যায় যে, সকলের জীবনের লক্ষ্যই অর্থ সংগ্রহ এবং তৎসাধনার্থ যে প্রকার কার্য্যই হউক না কেন, তাহা করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করা। স্বীয় পরিবার পালন ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য মানবের থাকিতে পারে কিম্বা আছে, একথা গ্রামের সহস্র লোকের মধ্যে একজনও বুঝেন না। তবে যে কেহ কেহ পর-উপকারার্থ মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন, সে কেবল বাহিরের যশ লাভের কুহকে। যশ মান রূপ আশু পুরস্কারের আশা না থাকিলে, গ্রামের অতি অল্প লোকই সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইতেন। গ্রামের সকলই নিস্তব্ধ ; কিন্তু বাদ বিসংবাদ, ঝগড়া বিবাদের সময় যে প্রকার উৎসাহ ও উদ্যম দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যেন সকলেই প্রকৃত কার্য্যক্ষম লোক। দলাদলীর সময় কিম্বা কাহাকেও অপদস্থ করিবার সময় গ্রামবাসীদিগের যে প্রকার উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধি হয়, তাহা যদি সমস্ত জীবনে কার্য্য করিত, তবে যে প্রকারেই হউক, বঙ্গবাসীদিগের জীবন কিছু রূপান্তর ধারণ করিত, সন্দেহ নাই। নগরে প্রবেশ কর। বাঙ্গালীর কলেজের অধ্যয়ন, স্কুলের পাঠ অভ্যাস, এ সকল ভাবিলে সকলের মনেই আশা হয়, কোন দিন ইহাঁরা প্রকৃত মনুষ্য হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সে আশা কেবল সৈকতময় বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং অমঙ্গলের হেতু। কলেজের সহিত বাঙ্গালীর অধ্যয়ন শেষ হইয়া যায়, এই কারণেই বাঙ্গালীর জীবন অন্যান্য দেশবাসীদিগের জীবন হইতে এত অনুন্নত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, এক শ্রেণীতে পাঠ করিয়া ইংরাজেরা প্রায়ই বাঙ্গালীদিগকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আর ২০ বৎসর পরে সেই বাঙ্গালী জীবনের সহিত সেই সাহেবের জীবনের তুলনা কর, দেখিবে, সে স্থলে সাহেব একজন দেবতা, বাঙ্গালী যেন অলসতার কীট। নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের নিকট শুনিয়াছি, যে সাহেব আঁফিসে নূতন প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীর নিকট কাজ শিক্ষা করে, ছয় মাস পরে সেই সাহেব সেই বাঙ্গালীর শিক্ষা-গুরু হয়। এই প্রকার ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি। বাঙ্গালীদিগের উৎসাহ,

উদ্যম, অধ্যবসায় কেন চিরস্থায়ী হয় না, তাহার কারণ আমরা আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই। তবে এইমাত্র বুঝিয়াছি, আড়ম্বরই বাঙ্গালী জীবনের সার সম্বল। সভায় বক্তৃতা কালে সকল যুবকই দেশহিতৈষী, অন্যের নিকট মর্য্যাদা লাভ করিবার সময় সকলেই নীতিপরায়ণ, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগের মনের অবস্থা আজ পর্য্যন্তও সে প্রকার হয় নাই। অভাব পরিজ্ঞাত না হইলে কখনও লোক সেই অভাব দূর করিতে পারে না, ইহা যেমন স্বাভাবিক; সেই প্রকার, মনের সহিত বাহিরের কার্য্যের সামঞ্জস্য না থাকিলেও লোক উন্নত হইতে পারে না, ইহাও ঠিক কথা। বঙ্গদেশের কি ধর্ম্মসমাজে, কি রাজনীতির হাট-বাজারে, আমরা সর্ব্বত্রই কেবল আড়ম্বরের চিহ্ন দেখিয়া জ্বালাতন হইতেছি। বঙ্গদেশের লোক কথা বলিতে চায় তখন, যখন কার্য্যের বহু বিলম্ব অনুভব করিতে পারে; অর্থাৎ তাহারা অনেক স্থলে কথা এবং কার্য্যকে পাশাপাশী দেখিলে দূরে গমন করে। রাজনীতির আন্দোলনই বল, কি ধর্ম্মনীতির কথাই বল, যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইলে পর যে প্রকার উৎসাহ দেখিয়াছিলে, আজ কাল কি আর সে প্রকার উৎসাহ দেখিতে পাও? ভাই বঙ্গবাসি, পৃথিবীর ইতিহাস পড়, দেখিবে, বৎসরের পর বৎসর কোথায় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রকৃত সাধক যাঁহারা, তাঁহাদের মন বিচলিত হইতেছে না। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সে বিষয়ের তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেই বিষয় লইয়া নীরবে যুগযুগান্তর পড়িয়া আছেন, পৃথিবী হয়ত তাঁহাদের অস্তিত্বও অনুভব করিতে পারিতেছে না; কিন্তু এমন সময় নিশ্চয় আসিবে, যখন তাঁহারা সিদ্ধ-মনোরথ হইবেন। আড়ম্বরের মধ্যে নৃত্য করা কিম্বা ঘুরিয়া বেড়ান প্রকৃত মনুষ্যত্ব নহে। মন্ত্র পরিগ্রহ করিয়া তাহাতে সিদ্ধ হওয়াই মনুষ্যত্ব। এ সংসারে যশ ও মান প্রাপ্ত হওয়া অধিক কষ্টের কথা নহে; কিন্তু সেই যশ মানের সম্মান রক্ষা করাই কঠিন। বাজারে ঢাক বাজান অতি সহজ কথা; কিন্তু সেই বাদ্য দ্বারা জয় লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই সকল কথা যে দিন বঙ্গদেশের সকলের হৃদ্‌বোধ হইবে, সে দিন বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকিলেও, আমরা অন্তরের আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিব। টাউনহলের সভায়, যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হইবার পরে যাইয়া যদি আমরা একটী প্রাণীকেও না দেখিতে পাইতাম, যাহাতে আমাদের তত দুঃখ হইত না, যদি অন্তরে প্রকৃত রূপে বিরক্তির বহ্নি জ্বলিতেছে, আমরা বুঝিতে পারিতাম। সে বিরক্তি কেবল কথায় আবদ্ধ নহে।

যে বিরক্তিভাব মানবের অভাব প্রকাশক, এবং যাহা একবার মনুষ্যের জ্ঞানের অধীনে আসিলে আর মানব চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, আমরা সেই অভাব-প্রকাশক বিরক্তির কথাই বলিতেছি। বঙ্গবাসীর মন যতদিন কেবল বাহ্যিক আমোদ প্রমোদ, বাহিরের আন্দোলন লইয়া থাকিতেই সুখ বোধ করিবে, অতদিন বাস্তবিক ইহাদের জীবনের উন্নতির আশা করা যায় না। যখন সকল প্রকার সার-শূন্য আড়ম্বর থামিয়া যাইবে, যখন যশের আশায় কিম্বা ক্ষণস্থায়ী মর্য্যাদার জন্য লোক নৃত্য করিবে না দেখিব, সেই দিন আমরা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এই আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করিব, এবং সেই দিন বুঝিব, এই আগুন প্রজ্বলিত হইয়া সময়ে বঙ্গদেশে মনুষ্যত্বের গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি করিবে।

শিক্ষা।

পৃথিবীতে সকলেই শিক্ষার্থী, কিন্তু প্রকৃত রূপে কেহই শিক্ষিত নহে। মানবের প্রাণ শিক্ষা,—মানবের অস্তিত্ব কল্পনা করিলে আমরা কেবল শিক্ষাই অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া উপলব্ধি করি। কিন্তু যে শিক্ষা মানবের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত হইল, এ শিক্ষার আদি অন্ত কোথায়? শিক্ষার আদি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্ত নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষার সীমা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীর-বিশিষ্ট মনুষ্যের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী,—এই আছে এই নাই,—যেন বিদ্যুৎবৎ পরিলক্ষিত হয়। এই শরীর বিশিষ্ট মানব দুদিন চারিদিনের কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র এই সংসারে লীলা খেলা করে; ইহার মধ্যে অনন্ত বাহ্য জগৎ এবং অনন্ত অন্তর জগতের কি শিক্ষা করিতে পারে? অনন্তের পরিমাণের তুলনায় কিছুই পারে না। অনেকে মনে বলিয়া থাকেন, মানব দুদিন দশদিন পরেই যখন সময়-সাগরের তরঙ্গে মিলাইয়া যায়, তখন আর শিক্ষার অন্ত নির্ণয় করা কষ্টকর কি? আমরা মৃত্যুকে শিক্ষার শেষ মনে করি না;—আমরা বিশ্বাস করি, মানব আত্মা অনন্ত শক্তির অধিকারী, সুতরাং অনন্তকাল শিক্ষা করে। যে শিক্ষা মানব অস্তিত্বের প্রথম দিন, অর্থাৎ জরায়ু হইতে শরীরধারী হইয়া পৃথিবী সন্দর্শনের দিন হইতে মানবকে আলিঙ্গন করে, সে শিক্ষা মানবের

চির সহচর,—চিরভূষণ, ইহার শেষ নাই, ইহার বিরাম নাই। এ চির শব্দের অর্থ সংসার ব্যাপক নহে, এ চির শব্দ অনন্তকাল ব্যাপক ; মানব যাহা কল্পনা করিতে পারে না, মানব যাহা ধারণা করিতে অক্ষম, এ চির শব্দ তাহাই। অপরিস্ফুট ভাষার সাহায্যে অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য বর্ণন করার অপেক্ষা কঠিন কার্য্য আর কিছুই নাই। বিধাতা আমাদিগের সহায় হউন।

আমরা যে শিক্ষাকে মানবের চিরসঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, এ শিক্ষা কি? এবং ইহা কেনই বা মানবের সহিত এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ? যাঁহারা শিক্ষাকে ইন্দ্রিয়াধীন মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের মতের মিল নাই ; কারণ ইন্দ্রিয়াধীন যে শিক্ষা, সে ইহ জগতের শিক্ষা,—সে কেবল বাহ্য জগতের শিক্ষা এবং সে শিক্ষা মৃত্যুতেই, অর্থাৎ শরীরের সহিত যখন মানবের বিচ্ছেদ হয়, তখনই, মানবকে পরিত্যাগ করে। আমরা শিক্ষাকে ইন্দ্রিয়াধীন মনে করি না। তবে এই বাহ্য জগতের দুর্ভেদ্য অণুপরমাণুর মধ্যে অণুপ্রবেশ করিলে আমরা দেখিতে পাই,—সংসারে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব ইহ সংসারে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে ; এবং ইহাও সময়ে সময়ে দৃঢ়রূপে মনে হয় যে, ইন্দ্রিয় না থাকিলে মানব পৃথিবীর পরিজ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিত না। যাহাই হউক, সে অন্য কথা ; কিন্তু এ শিক্ষা কি?—শিক্ষাকে আমরা মানসিক শক্তি নিচয়ের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। মানবের মধ্যে কতকগুলি শক্তি আছে, যাহাতে মানবকে সৃজিত প্রায় সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে ; সেই শক্তি সকলের জীবন শিক্ষা, ইহা ভিন্ন মানবে আর পশুতে কোন বিভিন্নতা নাই। কারণ যে শক্তি নিচয়ের *জন্য* মানব শ্রেষ্ঠ জীব, সেই শক্তিনিচয়ের জীবনই শিক্ষা ; শিক্ষার অভাবে সে শক্তি সকল হীন-জ্যোতিঃবিশিষ্ট পাশব শক্তির ন্যায়, তাহা কখনও মানবকে পশুর শ্রেণী হইতে উর্দ্ধে রাখিতে সক্ষম নহে। এই শিক্ষাই মানব, এই শিক্ষাই মনুষ্যত্ব,—এই শিক্ষাই মানবের সকল, এবং এই শিক্ষার সাহায্যে মানব সমগ্র সৃষ্ট জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মনুষ্য বলিলে আমরা বুঝি,—ইহা কেবল কতকগুলি শক্তির ভাণ্ডার। শিক্ষাই সে শক্তির প্রাণ। মনুষ্য বলিলে, যাঁহারা হস্ত পদ বিশিষ্ট প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করেন, ইহা ঠিক কথা যে, তাঁহারা মৃত্যুকেই মানুষের শেষ মনে করিবেন, এবং শিক্ষাকেও ইন্দ্রিয়াধীন পুস্তকের কাহিনী বিশেষ বলিয়া মনে করিবেন এবং তাঁহাদের শিক্ষার অন্ত নির্ণয় করাও

কঠিন নহে। কিন্তু আমরা মনুষ্য বলিলে কেবল হস্ত পদ বিশিষ্ট জীব মনে করি না ;—হস্ত পদ না থাকিলেও সে মানব, যাঁহার মধ্যে কতকগুলি শক্তির অস্তিত্ব আছে। আমরা মানবের সহিত শিক্ষার যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম, ইহা কখনও দুই চারি দিনের জন্য হইতে পারে না। যাঁহারা ভাবুক,—যাঁহারা চিন্তাশীল,—তাঁহারা আমাদের কথার গূঢ়তত্ত্ব অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শিক্ষার কতকগুলি সহায় আছে ;—অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজে সেই সহায় গুলির সংখ্যা অধিক, তজ্জন্যই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি, তাহা সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই আছে। যাহারা পৃথিবীতে ঘৃণিত, অপদস্থ ও অসভ্য বলিয়া অভিহিত,—যাহাদের জ্ঞান এখনও সভ্য সমাজের জ্ঞানকৌশল অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহাদের মানসিক শক্তি এখনও সম্যক বিকশিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির সমকক্ষ হইতে পারে নাই, তাহারাও এ শিক্ষার অধিকারী, এবং আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি, শিক্ষিত হইতে হইতে এক দিন তাহারাও সভ্য সমাজের সমকক্ষ হইতে পারিবে। এ বিশ্বাস আমাদিগের অন্তরে না থাকিলে, আমরা, শিক্ষার সূত্রকে টানিয়া আরও সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হইতাম।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা পুস্তকগত বিদ্যাকে অভ্যস্ত করার নাম শিক্ষা বলেন। শতাব্দী হইতে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল অমূল্য উপদেশ মানব কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে যে মানবের শিক্ষাকে উন্নীত করে, তাহা আমরাও স্বীকার না করি, এমন নহে ; কিন্তু আমরা উহাকে শিক্ষার একটী সহায় ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না ; বরং ইহা স্পষ্ট ভাবে বলি যে, পুস্তকে যে সকল উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে, মানব আপন ক্ষমতায় সকল সময়েই সে সকল লাভে সমর্থ ; আমরা বলি, এজগতে পুস্তক প্রচারিত না হইলে হয় ত আজ আমরা বিনা পরিশ্রমে শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম না, কিন্তু একেবারেই শিক্ষিত হইতাম না, এ কথা বিশ্বাস করি না। অবিশ্বাসী যাঁহারা,—যাঁহারা মানবের শক্তি-নিচয়ের চির উন্নতিশীলতা স্বীকার করেন না, যাঁহারা পরকালে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এ প্রকার কথা বলিতে পারেন যে, পুস্তক না থাকিলে লোক-সমাজ শিক্ষিত বা

উন্নত হইত না। যে শিক্ষা অন্ত শূন্য, আমরা সে শিক্ষাকে পুস্তকগত বিদ্যায় পরিণত করিতে কখনও ইচ্ছা করি না। আমরা বলি, সংসারের যে স্থানে কখনও কোন পুস্তক প্রচারিত হয় নাই, সেখানেও লোক শিক্ষা পায়। দার্শনিকই বল, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতই বল, সকলেই পুস্তকগত বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া কৃতীত্ব লাভ করে না। আমরা বলি, শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তিকা নাই ; ইহা অনন্ত আকাশের ন্যায়, বিশ্বের অতীত স্থান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ; নক্ষত্র জগতের দুর্নিরিক্ষ্য ও দুর্জ্ঞেয় কাহিনী হইতে ইহ সংসারের অদৃশ্য এবং অনন্নুমেয় পরমাণুর পটলে পটলে শিক্ষার রাজ্য বিস্তৃত। মানবের সম্মুখে ইহ সংসারের নানাপ্রকার সৃষ্ট জীব, জন্তু, অণু, পরমাণু এবং পরকালের অদৃশ্য অন্ধকারময় স্থানের কল্পনাতীত জীবের অস্তিত্ব মানবের শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র ছাড়া কোন মানব থাকিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়াও শিক্ষার পরাক্রম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। মানব ইচ্ছা করিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করুক বা না করুক, পৃথিবী, এবং পৃথিবীর পর অনন্ত জগৎ আপনার পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া পংক্তির পর পংক্তি মানবের জ্ঞানের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। মূল কথা— লোক ইচ্ছা করুক বা না করুক, ইহ সংসার, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা, অনবরত মানবকে শিক্ষা দিবেই দিবে। শিক্ষার হাত ছাড়া কেহই নহে। বায়ু যেমন মানবের শরীরের জীবন, শিক্ষা সেই প্রকার মানসিক শক্তির জীবন। বায়ুর রাজ্য হইতে কেহই যেমন পলায়ন করিতে পারে না, সেই প্রকার শিক্ষার রাজ্য হইতেও কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ইহা বায়ু হইতেও বিস্তৃত, কারণ বায়ুর সহিত কেবল শরীরের সম্বন্ধ, বায়ুর সহিত কেবল সংসারের সম্বন্ধ। মানবের মন যেখানে ধায়, সেইখানেই শিক্ষার উপায়। এই অনন্ত প্রকৃতি পড়িয়া কেহই শেষ করিতে পারে না, ইহা অভ্যস্ত করিয়া কেহ সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। শিক্ষার কি বিশ্বব্যাপী আশ্চর্য্য পরাক্রম ! ইহা ভাবিলে হৃদয় চমকিত হয়; মন বিস্ময়ে ডুবিয়া যায়। মানবের অপকৃষ্ট আস্তরণ জ্যোতিঃ বিহীন হইয়া মানবকে একেবারে অবনত করিয়া তুলে।

আমরা শিক্ষার যে অনন্ত-বিস্তৃত রাজত্বের কথা বলিলাম, ইহাকে কে আপনার ক্ষমতায় আয়ত্ত করিতে সক্ষম ? আর শিক্ষার পদার্থ নাই, এ কথাই বা কোন্ অহঙ্কারী মানব বলিতে পারেন ? আমি প্রকৃতরূপ শিক্ষিত হইয়াছি, পৃথিবীতে যাহা কিছু জানিবার সকল জানিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু

জানিতে হইবে, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, একথাই বা কে বলিতে পারেন? প্রকৃত শিক্ষার্থী যাঁহারা,—যাঁহারা শিক্ষার জন্য আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান, তাঁহারা কখনও এরূপ কথা বলিবেন না। প্রকৃত শিক্ষার্থীর প্রধান সম্বল বিনয়। তাঁহারা বলিবেন, শিক্ষায় আসক্তি আছে, কিন্তু পরিতৃপ্তি নাই; তাঁহারা বলিবেন, শিক্ষায় অনন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু শান্তি নাই; তাঁহারা বলিবেন, শিক্ষায় মনের এক প্রকার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু তাহা নিবারিত হয় না।

প্রকৃত শিক্ষায় বিনয় আছে, কিন্তু অহঙ্কার নাই; যাঁহারা শিক্ষার্থী, তাঁহাদের আত্মা বিনীত; তাঁহাদের মুখে কথা সরে না, উচ্চ কথা বাহির হয় না; মস্তক অবনত, ভাষা নীরব, প্রকৃতি গম্ভীর। কারণ, শিক্ষার বিশাল-বিস্তৃত ক্ষেত্র পানে যখন তাঁহারা চাহিয়া দেখেন, তখন মনে করেন, কিছুই হইল না, কিছুই হইল না। মুহূর্ত্ত যায়, সপ্তাহ যায়; মাস যায়, বৎসর যায়, যুগ যায়, শতাব্দী যায়, তবুও শিক্ষার রাজ্য অতিক্রম করা যায় না। শিক্ষা করিতে করিতে সংসারের আসক্তি যায়, ভালবাসা যায়; শরীরের বল যায়, মনের উৎসাহ যায়; জীবন যায়, মৃত্যু মানবকে আলিঙ্গন করে, তবুও শিক্ষার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। কি ভয়ানক তৃষ্ণা!! কি অপরিসীম রাজত্ব!!!

আন্দোলন ও কার্য্যে পরিণতি।

ঊনবিংশ শতাব্দী, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উন্নতির দ্বার যে প্রকার প্রশস্ত-ভাবে মুক্ত করিয়াছে, ভারতবর্ষের প্রতি তাদৃশ কৃপা-দৃষ্টি না করিয়া থাকিলেও, ইহা স্মরণ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, অল্প সময়ের আন্দোলনেই এদেশে প্রচুর পরিমাণে ফল দর্শিতেছে। নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিগণ চিরকালই চিৎকার করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যেখানে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই, সে পথে কখনও পদনিক্ষেপ করা বিধেয় নহে; আন্দোলনের পূর্ব্বেই তাঁহারা কার্য্য দেখিতে বাসনা করেন; কিন্তু আমরা চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, প্রথম আন্দোলন, তারপর তাহার ফল, অর্থাৎ কার্য্য। আন্দোলন ব্যতীতও যে সময় সময় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; বরং তাহারই আমরা অধিক পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলিয়া, বলিতে সঙ্কুচিত হই যে, আন্দোলনের ফল কখনও ভাল হয় না। ভুবের

মধ্যে যেমন তণ্ডুল সুরক্ষিত হইয়া থাকে ;--আন্দোলনের মধ্যে সেই প্রকার কার্য্য লুক্কায়িত থাকে। আন্দোলন চাই—নচেৎ কার্য্য রূপ তণ্ডুল প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই। কিন্তু যেখানে আন্দোলন তণ্ডুল-শূন্য তুষের ন্যায় সার-শূন্য, মহত্ত্ব শূন্য ; সে আন্দোলন কখনও উপকারী নহে। ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা কল্পনা এবং মত (*Theory*) পরিত্যাগ করিয়া কেবল কার্য্য দেখিতে বাসনা করেন। নব ভারতবর্ষ আজ আশানুরূপ উন্নত হইলে আমরা তাঁহাদিগের কথায় সায় দিতাম কি না, জানি না ; তবে এই মাত্র জানি, এখন ভারতবর্ষ যে প্রকার অবস্থায় রহিয়াছে, ইহাতে নিশ্চয় কল্পনা এবং মতের প্রয়োজন। মত এবং কল্পনার উপাসনা, নিশ্চেষ্ট মানবকে সময়ে সময়ে যেমন অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে, সেই প্রকার সময়ে সময়ে মানবমনে উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে। কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষে কল্পনার স্রোত, ভাবের স্রোত, কথার স্রোত ও আন্দোলনের স্রোত এত প্রবলতর বেগে বহিতেছে যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্য না দেখিয়া একেবারে উদাসীন হইয়া গিয়াছেন ;—ভাবিতেছেন, এ দেশের আর কিছু হইবে না। আমরা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি,—নিদ্রিত লোককে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতে হইলে, শব্দান্দোলন চাই ; কিন্তু মানবের যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আর শব্দের আবশ্যকতা থাকে না। ভারতবাসীগণ, সকলে না হইলেও, অধিকাংশই নিদ্রিত ; তাঁহাদিগকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার জন্য সভা, বক্তৃতা, আন্দোলন, তর্ক বিতর্ক সকলেরই প্রয়োজন, কারণ তাহা ভিন্ন তাঁহাদিগকে কে জাগরিত করিবে? ভারত ঘোর উদাসীনতা এবং অলসতা-সুষুপ্তিতে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই সময়ে কোন্ হিতৈষী আন্দোলন না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই কয়েক বৎসর হইতে ভারতে আন্দোলনের ধ্বনি উঠিয়াছে। সে ধ্বনি ভাল কি মন্দ, তাহা কার্য্য না দেখিলে কে বলিতে পারে? আমরা কার্য্য না দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করি না। ভারতের কত বিজ্ঞ ব্যক্তি সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমরা কোন কথা বলি নাই, তার অর্থ এ নহে যে, আমরা কার্য্য ছাড়িয়া কল্পনা বিস্তৃত হইতে দেখিলে অধিক সুখী হই। আমরা জানি, মানবকে প্রস্তুত না করিলে কখনও মানব কার্য্যের জন্য লালায়িত হয় না। অগ্নিকে বায়ুর পরাক্রমে উত্তেজিত না করিলে, যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া

যায়, সেই প্রকার মানবকে উৎসাহ, কল্পনা ও আশায় উত্তেজিত না করিলে মানব অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আমরা জানি, উৎসাহে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, অন্দোলনে নিদ্রিত মানব জাগরিত হয়। ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতির আশায় নিরাশ হইয়া যাঁহারা বিষণ্ণ রহিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা আহ্লাদ সহকারে জানাইতে ইচ্ছা করি, এই অল্প সময়ের মধ্যে কল্পনাযুক্ত মত প্রচারে, বক্তৃতার উৎসাহে ও আন্দোলনে ভারতবর্ষে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন করিয়াছে। * * * * ভারতবর্ষের কল্পনা, আন্দোলনে আরো কত কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা ইতিহাসের ভাবী পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া কে বলিতে সক্ষম ?

আন্দোলনের ফল কার্য্য, ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের স্রোত যত বর্দ্ধিত হইবে, ততই আমাদিগের আশা বৃদ্ধি হইবে। এই আন্দোলন কি করিলে বৃদ্ধি হয়, তাহা আমরা আজ বলিব না; তবে এই মাত্র জানি, মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা-বিলোপী আইন বিষয়ক আন্দোলন ভারত-ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা চিত্রিত করিবে; তবে এই মাত্র বিশ্বাস করি, বিদেশীয়দিগের অত্যাচার যত বৃদ্ধি হইবে, ভারতের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আন্দোলন ততই অনুপ্রবিষ্ট হইবে সে অনুপ্রবেশের ফল কি হইবে, তাহা ইটালীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

কে পরাধীন, অথবা পরমুখাপেক্ষী ?

প্রকৃত শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণী পরিদৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর লোক স্বতঃই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা লাভ করে, অন্য শ্রেণীর লোক আপন চেষ্টা বা উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়াই শিক্ষিত হয়। যাহারা অন্যের উপর নির্ভর করিয়া অল্পে অল্পে শিক্ষা-রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, বাহিক আড়ম্বর প্রভৃতির সহায়েই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অধিক বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে সক্ষম। আর যাঁহারা আপনাদিগের উপর নির্ভর করিয়াই শিক্ষিত হইতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদিগের গতি বা উন্নতি উভয়ই স্থির, সহসা কেহই তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু যদি প্রকৃত শিক্ষার কোন মহত্ত্ব থাকে,

*লর্ড লীটনের সময়ে, দুর্জ্জয় ইংরাজ প্রতাপে, এদেশের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ের আন্দোলন সম্বন্ধে এস্থলে লেখা হইয়াছে।

তাহা অল্পে অল্পে, অলক্ষিত ভাবে, তাঁহাদিগের আত্মাকেই এমন এক অলৌকিক শোভায় ভূষিত করে, যাহার তুলনায় পৃথিবীর সকল শিক্ষা জ্যোতিঃ বিহীন বলিয়া বোধ হয়।

প্রকৃত পক্ষে ইহার কারণ কি? এই পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা পরধন ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা সঞ্চয় করিয়া, আপন ভাণ্ডারকে, অল্পকালের মধ্যে, পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের মানসিক সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর। আর যাঁহারা আজীবন আপন আপন শরীরের রক্ত জল করিয়া, আপন চেষ্টায় ও উদ্যমে কিঞ্চিৎ অর্থও সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মনের সৌন্দর্য্যও দেখিয়া লও। উভয়ের সহিত তুলনা করিয়া, হে ঐশ্বর্য্যের উপাসক, বল ত কাহার মানসিক সৌন্দর্য্য স্থায়ী, অচঞ্চল, দৃঢ় এবং সুখপ্রদ? যাঁহারা ন্যায়বান ও অপক্ষপাতী, তাঁহারা কখনও কৃত্রিম শোভা সৌন্দর্য্যের সহিত প্রথম শ্রেণীর তুলনা করিতে ইচ্ছান্বিত হইবেন না; এবং তাঁহারা বলিবেন, প্রথম শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্যেব মধ্যেই পরিগণিত নহে, উহা অপকৃষ্ট শক্তির অপব্যবহারের ফল মাত্র।

আবার আর এক দিকে, যাহারা অন্যের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া স্বীয় শরীরের কান্তি বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের মনের শান্তি এবং বাহ্যিক চেহারার সহিত, যাঁহারা আপন অর্থে জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগের তুলনা কর। করিয়া বলত, হে সৌন্দর্য্যের উপাসক, কাহার শরীর অধিক জ্যোতিঃ-যুক্ত?

শিক্ষা বিভাগেও এইরূপ, এখানেও স্বানুবর্ত্তিতার এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান। স্বানুবর্ত্তিতার বিপদ অনেক, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই; এ পথ অত্যন্ত দুর্গম, অত্যন্ত ভীষণ; দুর্ব্বল মন লইয়া কেহই এত নৈরাশ্যের মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যাঁহারা অবিচলিত ভাবে আপন ক্ষমতার উপর আপনি তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন, তাহারাই ধন্য; এবং তাঁহারাই সৌভাগ্যবান। শিক্ষার পথে বিচরণ করিবার মানসে যাঁহারা অন্যের সাহায্য অবলম্বন করেন, কিম্বা অনিমেষ নয়নে অন্যের সাহায্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন; তাঁহারা চিরকাল পরাধীন, চিরকাল পরমুখাপেক্ষী; ইচ্ছা করিলেও আর তাঁহারা পরের সাহায্যের কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন না। এ কথা কেন বলিতেছি? শিক্ষার জন্য যাঁহারা অন্যের সঞ্চিত ধন ভিক্ষা করিতে গমন করেন, তাঁহাদের আপন অস্তিত্ব যে পরের অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, এ কথা কেন বলিতেছি? মানবের মন

দুর্ব্বল ; ইহা চিরকাল তীক্ষ্ণ প্রতিভার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এই দুর্ব্বল মন লইয়া যখন মানব তীক্ষ্ণ প্রতিভার নিকট গমন করে, তখন আপন অস্তিত্ব ডুবিয়া যায় ;—তখন মানুষ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবল অনুকরণ করিতে ইচ্ছান্বিত হয়। এই জন্যই আমরা পৃথিবীতে পরমুখাপেক্ষী জীবন এবং অনুবর্ত্তী জীবন দেখিতে পাই।

আমাদিগের দেশের এবং অন্যান্য দেশের কত সহস্র লোক যে এই প্রকারে আপনার অস্তিত্ব অন্যের সহিত মিলাইয়া দিতেছে, তাহার গণনা কে করিতে পারে ? পেন্সার, মিল, কমত, বার্কলি, হক্সলি, হামিলটন প্রভৃতির প্রতিভা দেশের সকল অধিকার করিয়া ফেলিল, দেশের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিলোপ করিল। মিল, স্পেন্সার পড়িতে যাইয়া যে লোক আপনার মত মানুষ বিসর্জ্জন দিয়া মিল স্পেন্সারের অনুবর্ত্তী হয়, ইহার কারণ কি ? মনের দুর্ব্বলতার জন্য এরূপ হয়, দুর্ব্বল মন লইয়া অন্যের ধন ভিক্ষা করিতে গমন করে বলিয়া, এরূপ আত্ম বিসর্জ্জন করে। এই প্রকার শিক্ষার্থী হইয়া যাহারা আপনার মত বিসর্জ্জন দেয়, তাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি বা না করি, সে এক কথা, কিন্তু ইহাদিগকে চিরকাল পরাধীন বা পরমুখাপেক্ষী বলিয়া স্বীকার করি।

শিক্ষাই মানবের জীবন, এবং শিক্ষাই মানবের স্বাধীনতার অবলম্বন। যাহারা শিক্ষিত নহে, তাহারা চিরকাল অন্যের মুখ চাহিয়া চলিতে বাধ্য হয়। এই শিক্ষা লাভের জন্য যাহারা অন্যের উপর নির্ভর করে,—শরীরের পুষ্টিসাধন কিম্বা মনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন, ইহার কোন প্রকার কার্য্যে যে অন্যের উপর নির্ভর করে, তাহারা, প্রকৃত শিক্ষার জীবন যে স্বাবলম্বন, তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়। যেখানে শিক্ষা, সেইখানেই স্বাধীনতা,—সেখানেই স্বানুবর্ত্তিতা। যেখানে প্রকৃত শিক্ষা নাই, সেই স্থানেই পরাধীনতা এবং অনুবর্ত্তিতা। অনুবর্ত্তী জীব তাহারা, যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত নহে। আমাদিগের দেশের লোক যে মিল, স্পেন্সার এবং কমতের এত অনুবর্ত্তী, ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, আমাদের দেশীয় লোক প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত নহে। এস্থলে সকলে স্মরণ রাখিবেন, পুস্তক মুখস্থ করিলেই শিক্ষা হয় না। শিক্ষা করিবার সময় যাঁহারা আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেন, তাঁহারা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইতে পারেন না, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ; কারণ প্রকৃত শিক্ষা স্বাধীনতামূলক। মানুষ, আপনার অস্তিত্ব-মূলে দাঁড়াইয়া, আপনার মত-গণ্ডির

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া, জগতের চতুর্দ্দিকের উপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত হইবেন, বিধাতার প্রদর্শিত বিশেষত্বের পথে অগ্রসর হইবেন, ইহাই মানুষের লক্ষ্য। একজন অন্ধ রূপে আপন অস্তিত্ব অন্যে বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা কখনও লক্ষ্য নহে। যদি ইহা লক্ষ্য হইত, আকৃতিগত পার্থক্য মানুষের মধ্যে কখনও পরিলক্ষিত হইত না। মানুষ যখন অন্ধরূপে নেতা, গুরু, বা শিক্ষকের অনুসরণ করে, তখনই মানুষ মলিন হয়, বিশেষত্বময় বৈচিত্র্য হারায়, তখনই গড্ডালিকা প্রবাহের সৃষ্টি হয়। যেখানে শিক্ষা আছে, অথচ স্বাধীনতা নাই, সে স্থানের শিক্ষাকে আমরা শিক্ষা বলি না; তাহা পর-সঞ্চিত ধন ভিক্ষা করার ন্যায় অস্থায়ী সম্পত্তি বিশেষ। আবার যেখানে স্বাধীনতা আছে, অথচ শিক্ষা নাই, সে স্থানের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ।

আমরা পূর্ব্বাবধি বলিয়া আসিতেছি—শিক্ষাই মানব, এবং শিক্ষাই মনুষ্যত্ব। এই শিক্ষার জন্য যাঁহারা অন্যের উপর নির্ভর করেন, তাঁহারাই আপনার স্বাধীনতা বিনষ্ট করেন, এবং তাঁহারা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইতে পারেন না। পৃথিবীতে যে শ্রেণীর শিক্ষার্থী অন্যের উপর নির্ভর করেন, তাঁহারা চিরকাল পরাধীন থাকেন, কিন্তু কখনও শিক্ষিত হন না; কারণ ব্যক্তি বিশেষের উজ্জ্বল প্রতিভা তাঁহাদিগের প্রতিভা মলিন করিয়া ফেলে; শিক্ষার বিশ্ববিস্তৃত অনন্ত রাজ্য তাঁহারা আর দেখিতে বা অনুমান করিতে সক্ষম হন না; তাঁহারা এক জনের প্রতিভা লইয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। এই প্রকার লোক পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও পরাধীন;—এই প্রকার লোক প্রকৃত প্রস্তাবে পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু যে সকল মানব আপনার শিক্ষাকে উন্নত করিবার জন্য, আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেয় না; যাহারা অন্যের পুস্তকের প্রস্তাবিত সত্য আপন বুদ্ধি বিবেচনায় মিলাইয়া নিজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, অথবা যাহারা ঐ সত্যকে জীবনগত করিতে সমর্থ, তাহারাই স্বানুবর্ত্তী। অন্যের প্রচারিত সত্য যখন আমার বুদ্ধি, বিবেক, ও বিবেচনার সহিত ঐক্য হয়, তখনই তাহা নিজের সত্য, তখন সে সত্যের জন্য অন্যের নিকট আত্ম বিসর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা কি? আর যতক্ষণ আপন বিবেচনার সহিত উহা ঐক্য না হয়, ততক্ষণই বা আমার কি? মিল বা স্পেন্সার উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী, তাহাতে আমার কি? তাঁহাদের সত্য যখন আমার বিবেক বা বিবেচনার সহিত ঐক্য হয় না, তখন তাহা কখনও আমার মঙ্গলের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি

যিনি, তিনি কখনও আমার জীবনের ভার অন্য জীবনের উপর ন্যস্ত করেন নাই। আমার বুদ্ধি, বিবেচনা একং বিবেক শক্তিই আমার পথপ্রদর্শক, আমার নেতা; অন্যের সত্য আমার নিকট অসত্য, যতক্ষণ তাহা না আমার উক্ত শক্তিনিচয়ের সহিত ঐক্য হয়। এই প্রকারে যাঁহারা, আপনার উপর আপনি অটলভাবে দাঁড়াইয়া, শিক্ষার অনন্ত রাজ্যে অগ্রসর হন, তাঁহারা কখনও পরাধীনতার ধার ধারেন না; এবং তাঁহারাই প্রকৃত স্বাধীন। শিক্ষার জন্য,—আপন জীবন লাভের জন্য, তাঁহারা একদিকে যেমন বাহ্য জগতের নানা প্রকার শোভা সৌন্দর্য্য, জড়জগতের অণুপরমাণুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন, সেই প্রকার তাঁহারা পৃথিবীর প্রচারিত পুস্তক রাশিকে তন্ন তন্ন করিয়া মানবের মানসিক শক্তির শোভা, সৌন্দর্য্য, বল, বীর্য্য পরীক্ষা করেন। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার সময় যেমন তাঁহারা আত্ম বিক্রয় করেন না, সেই প্রকার পুস্তক অধ্যয়ন করিবার সময়েও তাঁহারা আপনার মতকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের অনুবর্ত্তী হন না। তাঁহারা জানেন, বিবেক, বিবেচনা শক্তিই মানবের মঙ্গলময় পথপ্রদর্শক;—তাঁহারা জানেন, মানবের কেবল ঈশ্বরই লক্ষ্য। আর কোন প্রকার পথপ্রদর্শক নাই,—আর কোন লক্ষ্য নাই। সংসারের কোন প্রকার শক্তি বা প্রতিভা, কখনও তাঁহা-দিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত সকল সত্য তাঁহারা আপনাদিগের সত্য বলিয়া স্বীকার করেন; এবং সকল সত্যকে ঈশ্বরের সত্য বলিতেও কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হন না। পৃথিবীর রাজা বা শক্তি তাঁহাদিগের মস্তককে বিলুণ্ঠিত করিতে পারে, পাশব বল তাঁহাদিগের শরী-রকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু মনের স্বাধীনতা কখনও অপহরণ করিতে পারে না। এই প্রকার স্বাধীন জীবের অস্তিত্বে যে দেশ ধনী এবং গৌরবান্বিত, সেই দেশই প্রকৃত স্বাধীন, সেই দেশই প্রকৃত পক্ষে ধন্য। এতদ্ভিন্ন আর যাহা তাহা পরাধীন।

ভারত-সভার পরিণাম।

ভারত-সভা যে প্রকার উদ্যম এবং উৎসাহ সহকারে রাজনীতির পথে বিচ-রণ করিতেছেন, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। ভারতসভা এ পর্য্যন্ত যে সকল

কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে সকল কার্য্যই রাজনীতি সম্বন্ধীয়। রাজ-অত্যাচারে দুর্ব্বল ভারতবাসী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কাহারও মনে ক্ষণকালের জন্যও সুখ ও শান্তি ছিল না। পথে যাতায়াত করিবার সময়ে রাজবংশীয় নাবিকদিগের ভীষণ মূর্ত্তি, বিচারালয়ে পক্ষপাতী বিচারকের তীব্র দৃষ্টি এবং কর আদায়ের ভার-প্রাপ্ত অধিনায়কদিগের দয়া-শূন্য উগ্র আকৃতি দেখিয়া দুর্ব্বলচিত্ত মলিন ভারতবাসী যখন ভীত-কলেবর ধারণ করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ভারত-সভা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা ভারতসভার জন্মদিনকে ভারত-বর্ষের ইতিহাসের একটী উজ্জ্বল ঘটনা বলিয়া গণনা করিলাম। সে দিনের ঘটনা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। তখন আমাদের হাতে কোন পত্রি-কার ভার ছিল, সেই সময়ে ভারত-সভার জন্মের কথা কত আহ্লাদের সহিত দিক দিগন্তরে ঘোষণা করিলাম। দিন যাইতে লাগিল, আর ক্রমেই সেই আশার মূল ভারতসভা ক্রমে ক্রমে শত গুণে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। কি সুখের চিত্র! সিবিল-সর্ভিস-প্রশ্ন এবং যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের প্রতিবাদ-আন্দোলন করিয়া ভারতসভা বিখ্যাত হইলেন, চতুর্দ্দিকে তাহার নাম জয়-জয়কারে ধ্বনিত হইল। ভারতসভা, প্রশংসায় মুগ্ধ না হইয়া, ক্রমে ক্রমে আপন কার্য্য বিভাগ আরও বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশংসায় যে আপন আসন ঠিক রাখিতে পারে, তাহার পতন এ সংসারে কোথায়? ভারতসভা অনেক পরীক্ষা অতিক্রম করিলেন। কোন কার্য্যে বিশেষ রূপ কৃতকার্য্য না হইয়া থাকিলেও, ভারতবাসীর মনে রাজনীতির আন্দো-লন তুলিয়া এক তুমুল কাণ্ড সমাধা করিয়াছেন, এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইয়াছি। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া এখন ভাবিতেছি, ভারতসভা যেন কেবল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-সমালোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ কথা আমরা কেন্ বলিতেছি? ভারতসভার দোষের কথা মনে হইলে আমাদের অন্তরে আঘাত লাগে, লেখনী স্তম্ভিত হয়। বিলাতে ভারতসভার প্রতিনিধি ভারত সম্বন্ধে যে আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাহা কি আমরা আশার চক্ষে দেখিতেছি না? ১৫ই শ্রাবণ, ১২৮৬, আলবার্ট হলে, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগেকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সভা যে প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা কি আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে পাঠ

করি নাই ?* সর্ব্বসাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে ; আমরা জানি, এদেশের যদি কিছু হয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দ্বারায় হইবে। সেই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি যখন ভারতসভার চক্ষু পড়িয়াছে, তখন আর আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ কি ? যখন ভারতসভাকে আমরা প্রথম দিন আলিঙ্গন করিয়াছিলাম, সেই দিন আশা ছিল, ভারতসভা এদেশীয়দিগের সকল অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা করিবেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কি দেখিলাম ! এই অল্প সময়ের বহুদর্শিতায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছি। ভারতসভা বোম্বে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় নীরবে ছিলেন, সে কথা আমরা ভুলি নাই। পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবনের পর লক্ষ লক্ষ লোক যখন অস্বাভাবিক রোগে এবং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন ভারতসভা অবিচলিত ভাবে পাষাণবৎ ছিলেন, কিছুই সাহায্য করেন নাই, সে কথা আমাদের অন্তরে শেলবৎ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আবার বর্ত্তমান সময়ে যে পূর্ব্ববঙ্গের এত দুর্দ্দশা দেখিয়াও নীরব রহিয়াছেন, এ কথা আমরা কখনও ভুলিব না। ভারতসভা যখন প্রতিষ্ঠিত হন, তখন বলিয়াছিলেন, এদেশীয়দিগের সকল প্রকার দুর্দ্দশা দূর করিতে চেষ্টা করা হইবে। সে প্রতিজ্ঞা বোধ হয় এ যাত্রায় কল্পনাতেই রহিয়া গেল। ভারতসভার অধিনায়কগণ যতদিন এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অন্ন সংস্থানের জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিবেন, যতদিন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের জীবন রক্ষার্থ সদুপায় আবিষ্কার না করিবেন, ততদিন কখনও নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা পাইবেন না। নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা না পাইলে, ইহার ভাবী জীবনে কি আছে, আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের যে দুর্দ্দশা, তাহা হইলে ইহারও সেই দশা উপস্থিত হইবে। কিন্তু আমাদের এই ক্রন্দনধ্বনি কে শুনিবে ? ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের জন্য যে আমরা ব্যথিত হৃদয়ে এত চিৎকার করিতেছি, ইহা কাহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে ? অনেকে বলিবেন, ভারতসভা ত সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিয়ম করিয়াছেন !! আমরা বলি, নিয়ম করিলে কি হইবে, কাজ করিতেছেন কই ? তারপর কথা এই, এদেশের লোকদিগের প্রাণ বাঁচিলে ত বিদ্যা

* ঐ সভার অধিবেশনের পর ভারতসভা এ বিষয়ে আর কিছুই করেন নাই। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বা উন্নতির জন্য ভারতসভা কিছুই করিতেছেন না। এখন, ইহা কেবল আবেদনসভা রূপে পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষা ;—ষত্ব ণত্ব জ্ঞান। আমরা বলি, দুর্ভিক্ষের ভীষণ আক্রমণ ভারতকে পরিত্যাগ করিলে ত লোকের উন্নতি হইবে। ভারতসভা যদি রাজনীতির মূল-সূত্র অবলম্বন করিয়া স্বভাবের সাম্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ;—ভারতসভা যদি এদেশের লোকদিগের অসাময়িক পতনের মধ্যে ভাবী আশার বীজ সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে আমরা নীরবে থাকি, এবং ইহার সহিত সকল সহানুভূতির বন্ধন ছিন্ন করি। দেশের লোক অনাহারে মরিয়া যাক্, আমরা স্বভাবের সাম্য রক্ষা করি এবং ভাবী আশার স্বপ্নে নৃত্য করি !! ইহাই যদি ভারতসভার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা আমাদের লেখনী নিশ্চল হউক, সেই শত সহস্র কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমজীবীদিগের সহিত মিলিত হইয়া অমর-ধামে চলিয়া যাই। ভারতসভা আমাদিগের অস্থি-রাশির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতীয় জীবন উত্থাপনের চেষ্টায় রত থাকুন।

ভারত-সভা ও বিলাতে স্থায়ী প্রতিনিধি।

যিনি যাহাই বলুন, আমরা একটী সার জ্ঞান লাভ করিয়াছি ;—সেটী এই যে—পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার মধ্যে বিদেশীয় রাজার অত্যাচার সর্ব্ব প্রধান। ইতিহাস এই কথার ভূয়ঃ ভূয়ঃ সাক্ষ্য প্রদান করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অত্যাচার ভিন্ন অশিক্ষিত লোকের কখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় না ;—কিম্বা তাহাদিগের মন উৎসাহিত হয় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যাচার ব্যতীতও যে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে, সে কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ ত সে প্রকার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত অল্প। কেবল এই বাঙ্গলা প্রদেশে ৬।১০ কোটী লোকের বাস ; ইহার মধ্যে ৮।৯ লক্ষ লোক শিক্ষিত কি না, সন্দেহ। এদেশে প্রতি সহস্রে এক জন লোক শিক্ষিত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ রহিয়াছে। এখন যাহারা দেশের অভাব বুঝিয়াছে, তাহারা এই শিক্ষিত শ্রেণী ; এই শিক্ষিত শ্রেণী ভিন্ন অন্য কেহ কি দেশের কোন প্রকার হিতকর কার্য্যে যোগ দান করিয়া থাকে ? আমাদিগের দেশের লোকের কোন কথায় যে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করেন না, তাহার কারণ এই,—সমস্বর কিম্বা সমবেত বল এখনও এদেশে

সৃজিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের কোন কথার প্রতিবাদ করিলে, গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ মনে করেন, এ প্রতিবাদ কেবল এক শ্রেণীর, এদেশের সকলের নহে। ভারত-সভার প্রতিনিধি সম্বন্ধেও যে এই প্রকার কত কথা আরোপিত হইয়াছে, তাহা কোন্ শিক্ষিত লোক না পাঠ করিয়াছেন? ভারত-সভা যে জাতীয় সভা নহে, নানা কারণে তাহা আমরাও স্বীকার করি। যদি ইহা জাতীয় সভা হইত, তবে ইহার ভয়ে গবর্ণমেণ্ট জড়সড় হইতেন—ইহার ভয়ে সশঙ্কিত হইতেন; তাহা হইলে বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইবারও কোন প্রয়োজন থাকিত না।* এই স্থানে বসিয়াই সকল কথার প্রতিবাদ করা যাইত এবং প্রতিবাদে সুফল ফলিত। ভারত-সভা বলিলে, যদি ইংরাজেরা বুঝিত যে, এ সভা সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, তবে কি ইহাকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিত? কোন্ রাজা কবে জাতীয় সম্মিলিত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছে? ইতিহাস কি এই কথার প্রতিবাদ করে না? আমরা ত যাহা জানি, তাহা এই যে,—যখন রাজা বুঝিতে পারেন, এই কথাটী প্রত্যেক প্রজার হৃদয়ের ধ্বনি, তখন তাহা অমান্য করিতে কখনও সক্ষম হন না। ঘোরতর অত্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারীর পরাক্রমও এ স্থানে পরাস্ত হইয়া যায়। আমরাও ভারত-সভাকে এক শ্রেণীর মুখপাত্র বলিয়া জানি। তবে যে ইহাকে এত আদর করি, সে এই জন্য যে, ভবিষ্যতে ইহাই জাতীয় সভারূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সভা এখন হইতেই যখন সে পথে কণ্টক রোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। ভারত-সভার একান্ত পক্ষপাতী যাঁহারা, তাঁহারাও বলিবেন, ভারত-সভা এখনও জাতীয় সভারূপে পরিগণিত হইতে পারে নাই, ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা। যত দিন নিম্নশ্রেণী—কোটী কোটী মূক নিম্নশ্রেণী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ইহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ না করিবে, ততদিন ইহা এই প্রকারই থাকিবে। যে কয়েকটী কারণে ইহা জাতীয় সভা হইতে পারিবে না; তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

১। লোক অভাব না বুঝিলে কখনও সেই অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করে না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী, তাহারা গবর্ণমেণ্টের বড় একটা দোষ দেখিতে পায় না, তাহারা

*ভারতসভা যখন বিলাতে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

অন্ধ। যত দিন তাহারা গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখিতে না পাইবে, তত দিন কখনও সেই দোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। এখন আমরা যে সকল দোষ দেখিতে পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি, এই সকল অন্যায় অত্যাচারের কথাই তাহাদিগকে জাগরিত করিবার সহায়। এই সকল অন্যায় অত্যাচারের কথা তাহাদিগের কর্ণে কর্ণে ঘোষণা করিলেই তাহারা তাহার বিরোধী হইবে। আর যদি গবর্ণমেণ্টের সে স্বেচ্ছাচারিতার দোষ সকল সংশোধিত হয়, তবে কেন লোক একতা বন্ধনে বদ্ধপরিকর হইবে ? আর কেনই বা তাহারা সভায় যোগ দিবে ? ভারত-সভা যদি গবর্ণমেণ্টের অবৈধ ব্যবস্থা ও কার্য্যগুলি সংশোধন করিতে সক্ষম হন. তবে নিশ্চয় দেশের লোকদিগকে জাগাইতে পারিবেন না। ভারত-সভা এখন আপন কর্ত্তব্যকে কোন্ দিকে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না ; কিন্তু আমরা ত জানিতাম যে, জাতীয়-অভ্যুদয় ইহার প্রধান লক্ষ্য। সকলে স্মরণ রাখিবেন, সভা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অবৈধ কার্য্য সকলের ও বিধির প্রতিবাদ করিতে যাইয়া ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ স্থান অবলম্বন করিতেছেন। কারণ, এদেশের নিম্নশ্রেণী—অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীকে জাগরিত করিতে হইলে, অন্যায় অবৈধ অত্যাচারই এক মাত্র সহায়। সে গুলির সংশোধনের চেষ্টা করিতে যাইয়া সভা দেশের ভবিষ্যতের মহা অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

২। অভাব জ্ঞাপন ভিন্নও ভালবাসার দ্বারা লোককে জাগরিত করা যায়। এক জন লোককে এক জনের বিরোধী করিতে হইলে হয় এই চাই— সে লোকের নিকট অন্যের দোষ কীর্ত্তন করিতে হইবে ; না হয়, তাহাকে ভালবাসার দ্বারা এরূপ ভাবে বশ করিতে হইবে যে, সে কথা অবিশ্বাস না করে। এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে জাগরিত করিতে হইলে এই দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে,—একটী উপায় রাজার অত্যাচার প্রচার ;—দ্বিতীয় উপায় তাহাদিগকে ভালবাসায় আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শন। কতকগুলি লোক ভাল হয়, অন্যের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য ; আর কতকগুলি লোক ভাল হয়, কেবল উন্নতির আকর্ষণে। অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে উন্নতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার লোক অতি অল্প। নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা পাইতে হইলে, তাহাদিগকে এই বুঝিতে দেওয়া উচিত যে, তাহাদিগের জন্য বাস্তবিক সভার প্রাণ কাঁদে, হৃদয় ব্যাকুল ; তাহাদিগের দুঃখে সম-

দুঃখী না হইলে কখনও তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। ভারত-সভা কি নিম্নশ্রেণীর দুঃখে কাতর? ভারতসভা কি নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা পাইবার পথ রাখিয়াছেন? ভারতসভা কি দরিদ্রদিগের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়াছেন? ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, লক্ষ লক্ষ লোক এই কয়েক বৎসর রোগে, দুর্ভিক্ষে ও ধনীর অত্যাচারে হাহাকার ধ্বনি করিতেছে, ভারতসভা একবারও কি সেই দিকে কর্ণ দিয়াছেন? বোম্বে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় নিম্ন শ্রেণীর হৃদয়-বিদারক বিলাপ ধ্বনিতে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়াছে, কিন্তু তবুও ভারত-সভার কর্ণে যেন সে আর্ত্তনাদ পৌঁছে নাই! ম্যালেরিয়া রোগে পশ্চিম বাঙ্গলা একেবারে জন প্রাণী শূন্য হইয়া গিয়াছে, সে চিত্র দেখিলে কোন্ পাষাণ প্রাণ না ব্যাকুলিত হয়, বিষাদে মগ্ন হয়? কিন্তু ভারত সভার মনে সে দুঃখের চিত্র একবারও প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহাকে চিন্তিত বা বিষণ্ণ করিতে পারে নাই! পূর্ব্ববঙ্গের অস্বাভাবিক জলপ্লাবনের পর কত লোক অস্বাভাবিক রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে কথা সভা একবারও কি আপন স্মৃতিতে অঙ্কিত করেন নাই! আবার এবার পূর্ব্ববাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে কত লোক হাহাকার করিতেছে—কত অশ্রু দিন রাত্রি অজানিত রূপে, মৃত্তিকায় পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, ভারতসভা কি ইহার তত্বটাও সংগ্রহ করিতে পারিতেন না? অর্থ নাই, তাহা যেন স্বীকার করিলাম; কিন্তু গ্রামে গ্রামে যাইয়া সেই সহস্র সহস্র দরিদ্রদিগের কষ্টের কথা সংবাদ পত্রে লিখিয়াও ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন!! আর এরূপ পবিত্র কাজে অর্থ সংগ্রহ করাও কি কঠিন? মোট কথা সে প্রকার ইচ্ছা নাই। মোট কথা সে প্রকার জীবন নাই। মোট কথা সে প্রকার ভালবাসা নাই। ভালবাসা ভিন্ন কে কবে অন্যকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে? ভালবাসা ভিন্ন কে কবে অন্যের দুঃখে ব্যথিত হইয়াছে? সভায় বক্তৃতা—ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলেও ভালবাসা দেখান হয় না,—তাহাতে ক্ষণস্থায়ী যশ ও মানই সঞ্চয় হয়। সংবাদ পত্রে বিবিধ উপায়ে আপনার প্রশংসা ঘোষণা করিলেই নিম্নশ্রেণীর মন পাওয়া যায় না; তাহাতে কেবল নামই বিখ্যাত হয়। ভারত-সভার হৃদয়ে ভালবাসা নাই, অন্তরে সহানুভূতি নাই—নিম্নশ্রেণীর জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার প্রাণ কাঁদে না। সভার ঘোরতর উদাসীনতা ও নিশ্চেষ্টতা দেখিলে, সভার জীবন আছে কিনা, সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। দ্বিতল অট্টালিকায় আফিস পরিশোভিত থাকিলেই

সভার জীবন থাকে না,—যাহার কাজ নাই, তাহার জীবনও নাই। কেবল আবেদন প্রেরণ রূপ ফাঁকা আওয়াজ কোন সভার জীবন দিতে পারে না। যাঁহারা আজীবন সহরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কখনও দেশের দুরবস্থা কল্পনা করিতেও পারেন না। পশ্চিম বাঙ্গলায় যাইয়া দেখ, কত লোক রোগে শীর্ণ, অনাহারে জীর্ণ; হায়, তাহাদের মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই। পূর্ব্ববাঙ্গলায় যাইয়া দেখ, কত লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে—হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের শিক্ষা দিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেছেন, সভা তাহাও করিতে পারিলেন না! শিক্ষা যদি ম্যালেরিয়া-বিনাশক হইত, শিক্ষা যদি দুর্ভিক্ষ নিবারণের অমোঘ ঔষধ হইত, তবে ইহাই অবলম্বন করিতে আমরা পরামর্শ দিতাম। আমরা বলি, লোকের প্রাণ আগে, তারপর শিক্ষা। শিক্ষায় ভবিষ্যতে মঙ্গল হয় বলিয়া, কি এখন চুপ করিয়া থাকা উচিত? ভারত-সভা চুপ করিয়া আছেন বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে, দিন দিন সভা নিম্নশ্রেণীর এবং তাই সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশ্রেণীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এদেশের নিম্নশ্রেণীই শতকরা ৯২ জন। সভা সকলের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন বলিয়াই, আমরা বলি, সভা জাতীয় সভা নহে। বাস্তবিক, দিন দিন এ সভা সাধারণের সহানুভূতি হারাইতেছেন, জন কয়েক লোক কেবল অর্থ-লালসায় এবং যশ লালসায় ইহাতে যোগ রাখিয়াছেন।

৩। ভারত-সভা যাহাই মনে করুন না কেন, ইংরাজী ভাষার আদর করিতে যাইয়া সভা অধিকাংশের সহানুভূতি হারাইতেছেন। ভারতসভা যদি এ দেশের সভা হয়, তবে কেন ইহার কার্য্যাদি ইংরাজি ভাষায় নির্ব্বাহ হয়? ভারতের কত জন লোক ইংরাজী জানে? হয় বল, ইহা কেবল ইংরাজী বিদ্যার অধিকারীদিগের সভা, না হয়, উক্ত ভাষা পরিত্যাগ কর। ইংরাজি ভাষায় মন সতেজ হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাহা কি আমরা অস্বীকার করিতেছি? আমরা বলি, জাতীয় ভাষা ভিন্ন কখনও জাতির শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সভা জাতীয় ভাষায় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া ভাবী উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। হয় ত অনেকে বলিবেন,—আজ জাতীয় ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ভারতের অধিকাংশই তাহা বুঝিবে না। তাতে কি? আজ না বুঝুক, এ উপায় অবলম্বন করিলে অনেকে ভবিষ্যতে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী ভাষায় যখন প্রথম কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,

তখন এদেশের কত জন লোক ইংরাজী বুঝিত? এখন দেশীয়দিগের সকল কার্য্য যদি দেশীয় ভাষায় নির্ব্বাহ হয়, তবে নিশ্চয়, সকলেই জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ভারত-সভা কেবল যে উপকারের জন্য ইংরাজী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে; সভা জাতীয় ভাষাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাইট সাহেবকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে টাউন-হলে যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় ঢাকার জনসাধারণ সভার প্রতিনিধি নাকি বাঙ্গলায় মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সভা তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন নাই।* বহরমপুরের, রাজীবলোচন বাবুকে সভার অন্যতর অধ্যক্ষ সভার কার্য্য বিবরণের ভাষা সম্বন্ধে যে প্রকার অবমাননা করিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্তরে জাগিয়া রহিয়াছে। † ভারত-সভা জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া দিন দিন এক শ্রেণীর মুখপাত্র হইয়া পড়িতেছেন এবং সর্ব্বশ্রেণীর ভালবাসা হারাইতেছেন।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে, ভারত সভা জাতীয় সভা নহে; ইহাতে ভারতের সমগ্র মানবের যোগ নাই; ভবিষ্যতে যে ইহা সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভারতসভার যে কোন কার্য্য, তাহা এক শ্রেণীর কার্য্য; সমগ্র ভারতের নহে। ভারতের শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে ইহার প্রতি দিন দিন হত-শ্রদ্ধায় দৃষ্টি করিতেছেন। ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে অর্থ সংগ্রহ তাহার মধ্যে একটী প্রধান কারণ। প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে আমাদিগের এই বক্তব্য;—প্রথমতঃ প্রতিনিধি স্থায়ীরূপে রক্ষা করিলে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইবে, কিন্তু উপকার হইবে না। ইহা নিশ্চয় যে একজন লোক বিলাতে বসিয়া ভারতের সকল অভাব সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে গ্লাডষ্টোন, ব্রাইট, ফসেট প্রভৃতি মহাত্মাগণই প্রতিনিধি রহিয়াছেন, আর প্রতিনিধির প্রয়োজন কি? ইঁহাদিগের প্রাণ ভারতের জন্য যে প্রকার অস্থির, এরূপ আর কাহার? কিন্তু সেই দূর দেশে থাকিয়া ইঁহারা ভারতের সকল অভাব বুঝিতে পারেন না। বিলাতে যদি স্থায়ী প্রতিনিধি থাকে, তবে তাঁহাকে যে এই অভাবে পতিত হইতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

* সাধারণী ৩০ ভাদ্র, ১২৮৬।

† সাধারণী ৩০ ভাদ্র, ১২৮৬।

প্রতিনিধি যতই সহৃদয় হউন না কেন, এদেশে থাকিলে তিনি দেশের যত অভাব বুঝিতে পারিবেন, অভাবের চিত্র পরিত্যাগ করিয়া কখনও সে প্রকার পারিবেন না, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। কিছু দিন বিলাতে থাকিলে তাহাকে বিলাতের লোকেরা বলিবে—প্রতিনিধি সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি নহে। বাবু লালমোহন ঘোষ সম্বন্ধেও এ কথা অনেকে বলিয়াছেন। আমরাও এ কথা অস্বীকার করিতে পারিব না, কারণ ভারত-সভা কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা, ইহাতে নিম্ন-শ্রেণীর এবং সর্ব্ব-শ্রেণীর কোন চেষ্টা নাই। এই প্রকার অপমান সূচক কথা শুনিতে শুনিতে নিশ্চয় প্রতিনিধির মন বিরক্ত হইবে, কার্য্যের প্রতি শৈথিল্য জন্মিবে, বিলাতের পরিবর্ত্তন-স্রোত হয় ত তাহাকে কর্ত্তব্য-স্থান হইতে ভ্রষ্ট করিয়াও ফেলিতে পারে। কিন্তু যখন এদেশের সকলের মত এক হইবে, এদেশের নিম্ন-শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর কথার সহিত যখন প্রাণের মিল হইবে, তখন প্রতিনিধি সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পরিবে না। অগ্রে সেইরূপ মিলাইতে চেষ্টা করা উচিত। যে দেড় লক্ষ টাকায় বিলাতে প্রতিনিধি রাখিবার কথা হইতেছে, সে টাকার আয়ে স্বদেশী ৫০ জন লোক দেশের দ্বারে দ্বারে দেশের উন্নতি, জাতীয় একতার কথা প্রচার করিলে, ৫০ বৎসরে নিশ্চয় এদেশের নিম্ন শ্রেণীর সহানুভূতি কতক পরিমাণে এই দিকে ফিরিবে। এই প্রকার করিতে করিতে যখন সকলের প্রাণ-মন মিলিয়া এক হইবে—অর্থাৎ সমগ্র জাতি যখন একমত হইবে, তখন একটী ধ্বনিতে গবর্ণমেণ্ট নিস্তব্ধ হইবেন—তখন একটী প্রতিরোধের ধ্বনি শুনিলে আর গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইতে পারিবেন না। বিলাতে যে জাতীয়ত্বের এত বল, তাহা কেবল এই জন্য যে, প্রত্যেকে হৃদয় মন দিয়া কাজ করে—প্রাণ দেয়, তবুও পথ ছাড়ে না, নীতি বিসর্জ্জন দেয় না। রাজ সিংহাসন সে প্রকার একতায় কম্পিত হইয়া যায়—রাজা আর সিংহাসনে বসিতে সক্ষম হয় না। রাজা কি? সে কেবল প্রজাপুঞ্জেরই শক্তি সমষ্টি বই আর কিছুই নয়। সেই প্রজাপুঞ্জ যদি রাজার বিরোধী হয়, সাধ্য কি রাজার যে সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন? আমাদিগের দেশেও যখন সেই প্রকার একতার বল সৃজিত হইবে, তখন একমুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট সংশোধিত হইয়া যাইবে। এদেশের যদি কিছু মঙ্গলকর পথ থাকে, তবে সে একতার পথ, সমবেত-বল সৃজন করার পথ, সকলের প্রাণমন মিশাইয়া এক করার পথ। ভারতসভা আমাদিগের দেশের এই অভাব মোচন করিবেন,

আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদিগের সে ভ্রম পরিপূর্ণ আশা দূর হইতেছে। ইংরাজ জাতির অত্যাচার বৃদ্ধির সহিত এ দেশে সমবেত বল সৃজিত হইবে, সকলের মনপ্রাণ এক হইবে, ইহা আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস। প্রতিনিধি প্রেরণে যখন সে পথে কণ্টক পরিতেছে, তখন অর্থ ব্যয় করিয়া কি তাহা করা উচিত? অন্য দিকে প্রতিনিধি যখন সমগ্র জাতির প্রতিনিধি নহেন (আশা করি সকলেই এক মতে বলিবেন যে, জাতীয় প্রতিনিধি নহে), তখন ইহা দ্বারা নিশ্চয় কোন প্রকার ফল দর্শিবে না—ইংরাজেরা ইহার কথাকে কোন প্রকার গুরুত্ব বোধে ভয় করিবে না। এরূপ অবস্থায় বৃথা অর্থের শ্রাদ্ধে যোগ দিব কেন? অর্থ ব্যয়ে যোগ দিব কখন? না— যখন ভারত অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে—লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে! জাতির অর্থ, যে প্রকারেই হউক, দেশে থাকিয়া দেশের উপকারে লাগে, ইহা আমাদিগের একান্ত বাসনা। সেই অর্থ বিনা কারণে সাগরের পারে ব্যয় করিতে আমরা কখনও অনুমোদন করিতে পারি না।

আমরা ভারত সভাকে এ পথ পরিত্যাগ করিতে অন্তরের সহিত অনুরোধ করি। সভা যে কখনও ভ্রমে পতিত হইতে পারেন না, এ বিশ্বাস কখনও করিবেন না। এই ভ্রম হইতে সভা উদ্ধার হন, ইহা আমাদিগের একান্ত বাসনা। এ পথ পরিত্যাগ করিয়া দেশে সমবেত বল সৃজন করিতে চেষ্টিত হউন। গবর্ণমেণ্টর অন্যায় অত্যাচারই এ পথের প্রথম সহায়। দ্বিতীয় সহায় ভালবাসা এবং তৃতীয় সহায় জাতীয় ভাষা। এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া দেশের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন। যাঁহার অর্থ থাকে, সে অর্থ দিবে; যাহার ভাষা থাকে, সে ভাষা দিবে; যাহার জীবন থাকে, সে জীবন দিবে; আর যাহার স্বর থাকে, সে স্বর মিলাইবে। এই প্রকার করিলে সভা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এ দেশে যে বল সঞ্চারে সমর্থ হইবেন, সে বলের সীমা আয়ত্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট, আপনি ভয়ে ভয়ে, আপন অত্যাচারের জাল গুটাইয়া লইবেন। ইহা যদি না করেন, নিশ্চয় ভারত-সভা এক শ্রেণীর মুখপাত্র হইবে এবং নিশ্চয় ইহার দ্বারা ভারতের সমগ্র উন্নতির পথে কণ্টক পড়িবে। সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে ইহা শেষে এক জন কি দু'জনের সভায় পরিণত হইবে।

বাণিজ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে, প্রতারণা বলে, যে জগৎ বিখ্যাত ব্রিটীশ সেনাপতি পলাশি সমরে সিংহসদৃশ সিরাজুদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া, ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্য স্থাপনের বীজ বপন করিয়াছিলেন, সেই ক্লাইব প্রথমে বণিকের বেশে * এ প্রদেশে আগমন করেন। বাণিজ্য রাজনীতির প্রকাশ্য মন্ত্র—রাজনীতির অভিন্ন সহচর। যেখানে বাণিজ্য, সেইখানেই রাজনীতির কপটতা—প্রবঞ্চনা—ছলনা। রাজনীতি ব্যতীত বাণিজ্যের উন্নতি ক্ষণস্থায়ী। বাণিজ্য সাধনার উৎকৃষ্ট ফল অর্থ। কৃষিতে ধনের উৎপত্তি হয়। অর্থ এবং ধনে চির বৈষম্য। অর্থ কেবল মুদ্রা প্রভৃতিকে বুঝায়। ধন পৃথিবীর সমস্ত স্থায়ী সম্পত্তি। ধন ব্যতীত বাণিজ্য চলিতে পারে না, সুতরাং কৃষি বাণিজ্যের জীবন স্বরূপ। কৃষি এবং বাণিজ্যে এই অভিন্ন মিলন সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে ঘোর বৈষম্য বিদ্যমান। প্রীতি ও রাজনীতিতে যে বৈষম্য, কৃষি ও বাণিজ্যে ঠিক সেই রূপ। বাণিজ্য রাজনীতির কপট মন্ত্রে দীক্ষিত, পরিপোষিত এবং পরিবর্দ্ধিত ; এক দণ্ডও রাজনীতির কুহক মন্ত্র ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে না। রাজার সাহায্য ব্যতীত কখনই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কৃষিতে যে সরলতা, তাহা রাজার অধীনেই অপকৃষ্টতা লাভ করে। সমস্ত ইউরোপের বাণিজ্য-ইতিহাস, প্রথমটীর সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আধুনিক বঙ্গদেশের ভূমি এবং কৃষির দুরবস্থা দ্বিতীয়টীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যে ভূম্যধিকারীর ভয়ে প্রজা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, এবং ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে ও তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে নিরস্ত রহিয়াছে, সে জমিদার বা রাজাকে কৃষির মিত্র না শত্রু ভাবিব ? এরূপ জমিদার বা রাজা কৃষির পরম শত্রু। কেবল তর্কের জন্য বলিতেছি, এমন নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাজাই স্বীয় স্বার্থ সাধনার্থ প্রজাবর্গের সামান্য কৃষির উৎপন্নের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কৃষি সরলতায় পরিপূর্ণ, তাই রাজনীতির কপটতাময় সাহায্য হইতে চিরবঞ্চিত। বাণিজ্য কলহ বিবাদপূর্ণ—রক্ত-মিশ্রিত কপট ভাবই ইহার একমাত্র অবলম্বন, তাহাই রাজার অনুগ্রহ পরিপোষিত। কৃষি—শান্তিময়। সহরে প্রবেশ করিলে যে শব্দে কর্ণ বধির হয়, সে বাণিজ্যের কলহ বিবাদ ; আর পল্লিগ্রামে যে চিরশান্তি বিরাজিত, তাহা কৃষি হইতে উৎপন্ন। সংক্ষেপে

* ক্লাইব বণিকের কেরাণী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

কৃষি ও বাণিজ্যে এই অসামান্য বৈষম্য থাকিলেও দুইয়ের মধ্যে এমনি সংশ্লিষ্ট মিলন যে, একের অভাবে অন্য অসার ও অকিঞ্চিৎকর। সংসারের প্রকৃতি পুরুষে যে সম্বন্ধ, কৃষি বাণিজ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ; এ দুয়েই সংসারের উন্নতির সহায়তা করে। ইহারা ঘোরতর বৈষম্যময় হইলেও চিরকাল অভিন্নরূপে সংসারের উন্নতির সোপান। বাণিজ্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে না, কেবল অর্থ সংগ্রহ করার সহায়তা করে। এক দেশের বা এক স্থানের অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় দেশের অর্থ বৃদ্ধি করা বণিকদিগের সহজসাধ্য ব্যাপার। বাণিজ্যের চাক্‌চিক্যে ও কপটমন্ত্রে এমনি মায়াবিনী, প্রবর্ত্তিনী শক্তি নিহিত যে, একবার বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, আর রক্ষা থাকে না, ইচ্ছা করিয়া ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। আবশ্যক অনাবশ্যকের বাধা বাণিজ্য মানে না। বাণিজ্য অর্থ সঞ্চয়ের বীজ মন্ত্র, ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-পরিমাণ বৃদ্ধি করে না; এক স্থানের অর্থকে অন্য স্থানে রাশীকৃত করে মাত্র। এই উপায়ে দেশ বিশেষ যে একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে বণিকেরা একবারও ভাবেন না*। কিন্তু কৃষি সমগ্র পৃথিবীরই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ ধন কৃষি দ্বারাই বৃদ্ধি হয়। ব্যক্তি বিশেষের অর্থ বৃদ্ধিকে ধন বৃদ্ধি বলিতে পারি না।

যদিও অর্থের সহিত মানবের চিরকাল বিচ্ছিন্ন ভাব, তত্রাচ এই অর্থ সঞ্চয়ের জন্য সকলেই লালায়িত। এই অর্থ সঞ্চয়ের পথ কাহারও অবরুদ্ধ থাকে না। মানব অন্য সময়ে স্বীয় মন্ত্র গোপন করিতে না পারিলেও, অর্থ সঞ্চয়ের সময় মন্ত্র গোপন রাখিতে বিশেষ পটু। ধর্ম্মের সুবিমল কঠোর ভাব এখানে পরাস্ত। জন্ম মৃত্যুর নীরব নিস্তব্ধ সময়ে সংসারের অর্থের সহিত কাহার সম্বন্ধ ছিল? কিন্তু যাই মানুষ হইলাম, যাই মনুষ্যত্বের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল, অমনই অর্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম; পৃথিবীর সৎপ্রবৃত্তি সমুদয় বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইলাম না। সংসারের একমাত্র সার যেন অর্থ। এই অর্থ কি প্রকারে উপার্জ্জন করা যায়, তাহার উপায় পৃথিবীতে অনেক প্রকার। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষি অর্থের উৎপাদক; সমগ্র পৃথিবীর ধনের সৃষ্টিকারক; বাণিজ্য অর্থ আকর্ষণের অব্যর্থ মহৌষধ; স্থান বিশেষকে

* "The commerce of the world was looked upon as a struggle among nations, which could draw to itself the largest share of gold and silver in existence; and in this competition no nation could gain anything, except by making others loose as much or at the least.' Prof Mill's, Pol. Eco.

জ্যোতিঃ বা অর্থ শূন্য করিয়া স্বীয় ক্রোড় উজ্জ্বল করিবার এক অপূর্ব্ব আলো। বর্ত্তমান প্রস্তাবে অর্থ বৃদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায় বাণিজ্যই আমাদের আলোচ্য।

বাণিজ্য একমাত্র বিনিময়ের উপর নির্ভর করে। যে বিনিময়ে বিভিন্ন দেশীয় স্বভাব-সুলভ দ্রব্যাদি সকল প্রদেশেই সম পরিমাণে বিতরিত হয়; অর্থাৎ যাহাতে কোন দেশেরই কোন অভাব থাকে না, সে বিনিময় অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। শিল্প-নির্ম্মিত অথবা স্বভাবজাত দ্রব্যাদি সকল প্রদেশে এক প্রকার নহে; কোন দেশ কোন কোন দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত, আর অন্য কোন দেশ হয় ত অন্য কোন দ্রব্যের জন্যই প্রসিদ্ধ। এমন স্থলে বাণিজ্য মধ্যবর্ত্তী হইলে পরস্পর উৎকৃষ্টতম এবং নিকৃষ্টতম দ্রব্যাদির বিনিময়ে, পরস্পরের অভাবই দূর হয়। এই জন্যই বাণিজ্যে অশেষ প্রকার মঙ্গল সাধিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে কেবল দ্রব্যাদির বিনিময়ের দ্বারা বাণিজ্য চলিত। তখনকার লোক অধার্ম্মিক ছিলনা; বাণিজ্যের কুহক মন্ত্র তখনও জাল বিস্তার করে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থ, দ্রব্যাদি বিনিময়ের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়াছে। এখন যে বাণিজ্য চলিতেছে, সে কেবল কার্য্যের সুবিধা মাত্র। অর্থের দ্বারাই আজ কাল বিনিময় কার্য্য চলিতেছে; এই অর্থই বণিকদিগের সাধনার প্রশস্ত পথ। পৃথিবীর উন্নতি, দেশের অভাব মোচন প্রভৃতি বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য সকল বর্ত্তমানে বণিকদিগের মন হইতে অবসর লইয়াছে, অন্যকে ফাঁকি দিয়া স্বীয় স্বার্থের অনুধাবন করাই এখন বাণিজ্যের মূলমন্ত্র হইয়াছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, বিনিময়ের মধ্যে অর্থ মধ্যবর্ত্তী না থাকিলে অনেক অসুবিধা হইত, হয় ত বর্ত্তমান বাণিজ্যের এত উন্নত অবস্থাও হইত না। এমন কি, হয় ত কোন রাজ্য, উপরাজ্য আজ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম ধনী রাজ্য বলিয়াও অভিহিত হইত না। কিন্তু যে বিনিময়ে আমার অর্থ সমূহ কাড়িয়া দেশান্তরে লইয়া যায়, আমার বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে, আমার অর্থে অন্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত করে, সে বিনিময়ের অপকারের কথা কেন না বলিব? * তুমি পৃথিবীর স্বার্থপর বণিক, তুমি বলিবে—"তুমিও এই প্রকার কর। কপট মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীকে পরিশোভিত কর, যদি করিতে না পার, তবে বাণিজ্যের মধ্যে আসিও না।" মানবের ছলনা এর অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট ছবি দেখাইবে !!

---

* "any branch of trade which was supposed to send out more money than it brought in, however ample and valuable might be the returns in another shape, was looked upon 'as loosing trade." Prof mill's Pol. Eco.

বাণিজ্যের গৌণ উদ্দেশ্য সাম্য সংস্থাপন। সাম্য অনেক প্রকারে স্থাপিত হইতে পারে। সংসারের বৈষম্য নানা প্রকার; ইহাদিগের অনেক বৈষম্যই বাণিজ্য দ্বারা দূর হইত, কিন্তু বর্ত্তমান বাণিজ্য আরও অনেক প্রকার বৈষম্য আনিয়া সভ্য সমাজ সমূহে উপস্থিত করিতেছে। তুমি উৎকৃষ্ট বণিক, তুমি সংসারের অর্থ অপহরণ করিয়া স্বীয় কপট সাধনার বলে এ সুখের সংসারকে ধন-বৈষম্যের দ্বারা পূর্ণ করিতেছ। আর তুমি ব্যবসায়ী,—তুমি সংসারের সখ্যভাব সংস্থাপনের ভাণ করিয়া, কলহ, বিবাদ, বিসংবাদের দ্বারা সংসারকে পরিপূর্ণ করিতেছ; এক রাজ্য ভাঙ্গিতেছ, আর রাজ্য গড়িতেছ; স্বীয় স্বার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমার বৃথা এ ভাণ কেন? আর তুমি বণিকের বেতনভোগী ভৃত্য—তুমিই বা এক রাজ্যকে হীনপ্রভ করিয়া, তোমার প্রভুর ক্রোড় উজ্জ্বল করিতেছ কেন? তোমার এই চাতুরীতে সংসারের কি উপকার হইতেছে? আর তুমি হে প্রবঞ্চক, বৃটিশ বণিক—তুমিই বা বৃথা ভাণ করিয়া, ছদ্মবেশে ভারতের উপকার করিবার ছলনে, দেশীয় রাজাদিগের সৈন্য সামন্তের সহিত চক্রান্ত করিয়া, রাজ্য কাড়িয়া লইতেছ কেন? ইহাতে তোমাদের স্বার্থসিদ্ধি বই আর কি হইতেছে? কিন্তু তোমরা ত বলিতে কুণ্ঠিত নও যে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্য সংসারের বৈষম্য দূর করা। * বাস্তবিক ধরিতে গেলে, যেখানে বাণিজ্য, সেই খানেই রাজনীতি, সেই খানেই রাজনীতির কপট মন্ত্র। যত দিন বাণিজ্যের মধ্যবর্ত্তী অর্থ থাকিবে, তত দিন এই অসদ্ভাব আর দূর হইবে না। জাতীয় উদভ্রান্ত এই হইতেই হইবে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বণিক, তাঁহারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধোগতির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয়েরা চিরকাল ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, ইহারা স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য কোন কালে পরের স্বার্থ নষ্ট করে নাই; এমন কি শ্রীকৃষ্ণ, কণিক এবং চাণক্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও, ভারতবাসীরা কখনও অন্য দেশ লুণ্ঠন করিতে সাগরের পর পারে যান নাই; চেষ্টাও করেন নাই যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ, তাঁহারা চেষ্টা করিলে যে সমুদ্রে গমনোপযোগী পোত নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতেন না, এ কথা কথাই নহে। তাঁহাদের সে রকম ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই, যে রাজ্যে যাঁহার অধিকার, তিনি তাহা রক্ষা করিতেই সদা যত্নশীল রহিতেন, রাজনীতির প্রতারণার কুহক মন্ত্রে

* Adison's spectator, Page 120 and 121.

তাঁহারা দীক্ষিত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা উৎকৃষ্ট বণিক হইতে শিক্ষা করেন নাই; সুতরাং দিন দিন প্রভাহীন হইয়া অবশেষে মুসলমানদিগের কুহক মন্ত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া, রাজ্যভার ছাড়িয়া দিলেন! সেই হইতেই ভারতবর্ষ অন্যের হাতের ক্রীড়ার বস্তু হইল !!

বিভিন্ন দেশীয় দ্রব্যাদির বিনিময়ের উপর বাণিজ্য নির্ভর করে। বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থ বৃদ্ধি বা অর্থ সংগ্রহ। উৎপন্নের মূল পরিশ্রম—মূলধন এবং জমি। এই তিনটীর সামঞ্জস্য ব্যতীত উৎপন্নের শ্রীবৃদ্ধি হয় না।* ইহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধিতে উৎপন্নেরও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়। এই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

১ম পরিশ্রম। পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্তও পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য ধার্য্য হয় নাই। কৃষক পৃথিবীর উৎকৃষ্ট পরিশ্রমী। অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বর করিয়া, ভূমির অসারত্ব সার বস্তুর দ্বারা দূর করিয়া, রৌদ্র তাপে স্বীয় স্বীয় শরীর ক্ষয় করতঃ, কৃষকেরা প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করে। সেই শস্যের উপর পৃথিবীর জীবন। সুতরাং কৃষকই মানব জীবন রক্ষার প্রধান সহায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কৃষকের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য ধার্য্য হইল না; আর যে পর্য্যন্ত ধনলুব্ধ বণিকদিগের মধ্যে একটু দয়ার সঞ্চার না হইবে, সে পর্য্যন্ত হইবেও না। জমীদারের ভয়ে, কৃষক নির্দ্দিষ্ট উৎপন্ন অপেক্ষা, উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ সে বৃথা পরিশ্রম জমিদারের উদর পূরণের জন্য,—জমিদারের স্বার্থ সাধনের জন্য নিঃশেষ হইয়া যায়; তাহাতে কৃষকের কোন লাভ নাই। দ্বিতীয়তঃ, বণিকেরাই কৃষকদিগের পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থ-লুব্ধ বণিকেরা এক পয়সাও পরিশ্রমের মূল্য বাড়াইতে স্বীকৃত নহে। ইহাতে অনেক কৃষক প্রাণে মারা যাইতেছে। সেই জন্যই অনেকে আর এই কার্য্যে হাত দিতে স্বীকৃত হয় না। কৃষক সমস্ত বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে শস্য উৎপন্ন করে, তাহা বণিকেরা যে অর্থে ক্রয় করিয়া লয়, তাহা তাহার এক মাসের আবশ্যকীয় দ্রব্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। কৃষকের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার ভারতবর্ষে নাই বলিলেও চলে। বণিকদিগের কপট মন্ত্রে কৃষকেরা একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। তাহাদের কৃষির এবং জীবন যাত্রার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি

* "The Increase of production therefore, depends on the properties of these elements (Labour—Capital and land)." Prof Mill's. Pol.Eco.

ক্রয়ের সময় অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়; কিন্তু তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য নিতান্ত অল্প; অর্থাৎ কৃষকের ১১ মাসের পরিশ্রমের উৎপন্নের মূল্য, তাহার এক মাসের আবশ্যকীয় দ্রব্যেই শেষ হইয়া যায়; সুতরাং কৃষকের বাণিজ্য এক মাসেই বন্ধ হয়। এই জন্যই ভারতবর্ষে এত ধন-বৈষম্য বিদ্যমান। যাঁহার প্রচুর পরিমাণে অর্থ আছে, সে অনায়াসে আমার সমস্ত বৎসরের পরিশ্রমের দ্রব্যাদি কিনিয়া লইল, আর আমি কৃষক—এত অল্প অর্থের অধিকারী হইলাম যে, এক মাসেই আমার বাণিজ্য শেষ হইয়া গেল। কাজেই বলি, সংসারে পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার নাই বলিয়াই সমাজের অশেষ অনিষ্টের মূল—বৈষম্যের এত আধিপত্য; আর উৎপন্নের মূল—কৃষকের অবলম্বন ভূমির এত দুরবস্থা। অন্যস্থানের কথা বলিতেছি না; ভারতবর্ষই আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য। ভারতবর্ষে এখন যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, কৃষকেরা চেষ্টা এবং যত্ন করিলে তাহার দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে।* কিন্তু তাহারা যত্ন করে না, কারণ তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না। অনেকে বর্ত্তমানে, মিলের (John Stuart will) অনুসরণ করিয়া লোক সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন†। কিন্তু কেহই পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন না। পরিশ্রমের পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট না হইয়া যদি লোক সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং কমাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আরও উৎপন্নের অংশ কমিয়া যাইবে; এ কথা তাঁহারা একবারও ভাবেন না। এই জন্যই আমরা বলি, প্রথমতঃ পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। পরিশ্রম বৃদ্ধিরও আবশ্যক। পরিশ্রমের বৃদ্ধি ধরিলেই সমগ্র মানব সংখ্যার বৃদ্ধি বুঝায়। এই পৃথিবীতে সম্পাদকীয় কার্য্য অনেক, সম্পাদক অল্প। সম্পাদক সংখ্যা অধিক হইলে কার্য্যের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু মনুষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, আবার অনেক প্রকার ক্ষতি হয়। সেই জন্যই বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির মধ্যে সকলেরই পতন অনিবার্য্য। মানবের মধ্যে যতই কেন বিজ্ঞানের উন্নতি হউক না, বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করিবার যতই কেন মানুষের ক্ষমতা হউক না, এই অনিবার্য্য

* ব্যবসায়ী ১ম ও ২য় সংখ্যা।

† "And what checks population is not multitude of deaths, but fewness of births. * * Population is actually kept down by starvation". Mill's Pol. Eco.

পতনের গতিরোধ হয় না। * যদি হইত, তবে এ সংসার মানব মণ্ডলীর দ্বারা পরিপূর্ণ হইত; পৃথিবীর সম্পাদকীয় কার্য্যও শেষ হইয়া যাইত। স্বভাবের গতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; এমন স্থলে আমরা জীব বৃদ্ধির কামনা করি না। তবে সাময়িক জীব সমূহের মধ্যে সম্পাদক এবং পরিশ্রমীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক বাসনা। ভারতবর্ষে অনেকে অন্যের উপর জীবিকা নির্ব্বাহের ভার অর্পণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছেন—এ সংসারে অলসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। অস্মদ্দেশীয় একান্নভুক্ত পরিবার সমূহ ইহার উদাহরণ। এক জনের জীবনের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া অনেক নব্য যুবক অলস হইয়া পড়িতেছেন। এ পৃথিবীতে কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্যের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম নহে। মনুষ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক কর্ত্তব্য কার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য সাময়িক লোক সকলেই দায়ী; পক্ষান্তরে ক্ষণভঙ্গুর জীবনে কেহই একাধিক জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন না; তজ্জন্যই অলস ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য গুলি অসম্পন্নই থাকিয়া যায়। এই জন্যই দেখা যায়, সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক, সম্পাদক অল্প। আমরা এই অলস ব্যক্তিদিগকে পরিশ্রমী হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য চেষ্টা করিতে পরামর্শ দেই। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর অলস লোকমণ্ডলী কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া পরিশ্রমে নিযুক্ত হইলে, আর সম্পাদকের অভাব থাকিবে না।

স্থান বিশেষে কার্য্যক্ষেত্রের পরিমাণে কর্ম্মদক্ষ লোকের অভাব হইলে, জনসংখ্যা-বহুল প্রদেশ হইতে লোক আনয়ন করিয়া অভাব পূরণ করিতে হইবে। এ জন্য আমরা কুলী চালানের পক্ষপাতী। ইহাতে এক স্থানের দারিদ্র্য নিবারিত হয়, এবং অন্য স্থানে উৎপন্ন অধিক হয়। কিন্তু আমরা কুলিদিগের প্রতি যে পাশব অত্যাচার হয়, তাহার পক্ষপাতী নহি।

দ্বিতীয়তঃ—মূলধন। পরিশ্রমের উদ্বর্ত্ত সামগ্রীর নাম মূলধন। মূল ধন ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। অর্থ মূলধন নহে, কেননা তাহাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না।† অর্থ নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ; মূলধন সীমার অতীত। মূলধন সঞ্চয় করা সকলের জীবনে ঘটিয়া উঠে না। কেহ অতি

---

* "In the Human race (which is not generally subject to be eaten by other species) the equivalents for it are death or disease". Prof Mill's Pol. Eco.

† "Money can not in itself fulfill any part of the of fice of capital, since it can afford no assistance to production." Mill's. Pol. Eco.

কষ্টে উদরান্ন সংগ্রহ করিতেই সময় অতিবাহিত করিতেছেন; কেহ বা প্রচুর পরিমাণে অর্থের উপর অর্থ ঢালিতেছেন! মূলধন ভবিষ্যতের চিন্তা হইতে উৎপন্ন হয়। যাঁহাদিগের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য নাই, তাঁহারা মূলধন সঞ্চয়ে তাদৃশ সুখ পান না। এই মূলধনই বাণিজ্যের জীবন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থ না থাকিলে, মূলধন ব্যতীতও ব্যবসা চলিতে পারে, কিন্তু যখন সে নিয়ম প্রচলিত নাই, তখন মূলধন ব্যতীত বাণিজ্য এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। কিন্তু এ প্রকার মূলধনের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদিগের প্রায়ই বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই। ভারতবর্ষে মূলধনের অধিকারী লোকমণ্ডলী এক প্রকার সুখ লালসার বশীভূত; কেহই বাণিজ্য ব্যবসার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। তজ্জন্যই ভারতবর্ষে বাণিজ্যের এত হীনাবস্থা। যাঁহারা মূলধনের অধিকারী, তাঁহারা কখনও তাহা ব্যয় করিতে স্বীকৃত নহেন। তাঁহারা জানেন না যে, বাণিজ্যের টাকা ব্যয় মধ্যে গণ্য নহে। এই মূলধনের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। কৃপণ, সমাজের অপকারী জীব নহে; কিন্তু অমিতাচারী মূলধনের অধিকারীর বৃথা অর্থ ব্যয়ে, সংসারের কোন স্থায়ী উপকার নাই †। বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেকে বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিলাসপ্রিয়তার জন্য মাসে মাসে শত সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া যায়; এই অকারণ ব্যয়গুলি একটু সংযত হইলেও সংসারের অনেক উপকার হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, বিলাসপ্রিয় লোকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইতেছে। যে দেশে অযথা অর্থ ব্যয়কে বড় লোকেরা, উদার স্বভাবের চিহ্ন মনে করে, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? বিশেষতঃ আজ কাল আবার পরিশ্রমীদিগের মধ্যেও বিলাসের চিহ্ন প্রবেশ করিতেছে। কৃপণতা বর্ত্তমান সময়ে ঘৃণার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কৃপণের সংখ্যা কমিয়া অমিতাচারীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি

† "If all vices, however, against which morality dissuades, there is not one more undetermined than this of avarice. Misers are described by some, as men divested of honor, sentiment, or humanity; but this is only an ideal picture, or the resemblance, at least is found but in a few. In truth, they who are generally called misers, are some of the best members of society. The sober, the laborious, the attentive, the frugal, are thus styled by the gay, giddy, thoughtless and extravagant. The first set of men do society all the good, and the latter, all the evil that is felt. Even the excess of first no way injure the commonwealth; those of the latter are the most injurious that can be conceived." Goldsmith on Political frugality.

পাইতেছে। ইহাতে যে দেশের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

তৃতীয়তঃ—জমি। বাণিজ্যের মূল কৃষি এবং শিল্প। কৃষি জমি হইতে উৎপন্ন হয়। এই জমির উর্ব্বরতা শক্তির সহিত কৃষির উন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ। কৃষির উন্নতির সঙ্গেই বাণিজ্যের উন্নতি। কৃষি ব্যতীত বাণিজ্য থাকিতে পারে না। * উৎপন্নের অবলম্বন কৃষি এবং শিল্প; এবং জমির উর্ব্বরতার উপর কৃষির উন্নতি; সেই জন্যই জমি উৎপন্নের প্রধান মূল। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির পূর্ব্বে এই জমির উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষের মৃত্তিকা কৃষির বিশেষ উপযোগী হইলেও, অন্যান্য দেশ হইতে ইহাতে অনেক অল্প পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার একমাত্র কারণ জমির হীনাবস্থা। উপযুক্ত রূপ সার না দিয়া যত দিন এই মৃত্তিকার উর্ব্বরতার জন্য সকলেই চেষ্টিত না হইবেন, ততদিন কৃষির তাদৃশ উন্নতি হইবে না; সুতরাং বাণিজ্যেও তাদৃশ লাভ হইবে না। অস্থি উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু অস্থি-সারের ব্যবহার এদেশে মোটেই নাই। এদেশের অস্থি বিদেশে চালান হই-তেছে। † আমাদের দেশীয় সামান্য লোকেরাই কেবল কৃষি ও বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, অথচ এই দুইটীই অর্থের প্রকৃত সোপান। ভারতবর্ষে যে সকল জমিতে বর্ত্তমানে কৃষি উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল জমিতেই বিশেষ চেষ্টা করিলে দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। এই মহাদেশে কৃষির জন্য কাহাকেও বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার কারণ বীজ বপন করিলেই আবশ্যক মত শস্য উৎপন্ন হয়। আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব না হইলে কে বৃথা পরিশ্রম করে? কিন্তু আবশ্যকীয় বস্তুর অতিরিক্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন না হইলে, বিনি-ময় চলিতে পারে না, কারণ বিনিময়ের দ্রব্য না থাকিলে কি প্রকারে তাহা চলিতে পারে? বিশেষতঃ বিনিময় করিলে যে তাহাদের লাভ হইবে, সে কথার মর্ম্মও তাহারা বুঝিতে পারে না; কারণ পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই বলিয়াই তাহাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ জমিদার। এই জমিদারেরাই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে দেয় না। যদি কোন কৃষক অর্থ লাভের আশায় দ্বিগুণ পরিশ্রম সহকারে স্বীয় ক্ষেত্র হইতে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদন করে, তবে তাহা লইয়া জমিদার মহলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়,

---

* ভারতসুহৃদ্ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা।

† নব্যভারত একাদশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধ দেখ।

এবং যে পর্য্যন্ত সেই উৎপন্নের কতক অংশ জমিদারের গৃহজাত না হয়, সে পর্য্যন্ত সে অনর্থের শেষ হয় না। এই কারণেই কৃষকেরা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে না। অন্যদিকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জমিই পতিত হইয়া রহিয়াছে; সে সকল ক্ষেত্রের কৃষক নাই। গবর্ণমেণ্ট কুলি চালান দিয়া এ অভাব কতক পূর্ণ করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও অনেক স্থান অনাবাদী রহিয়াছে। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহই প্রবৃত্ত হয় না; অতি অল্প সংখ্যাই এই কার্য্যকে জীবনের লক্ষ্য মনে করে। পাহাড় পর্ব্বত এবং সুন্দরবন বাদেও ভারতের এত জমি অনাবাদী হইয়া আছে যে, সে সকল জমিতে কৃষি করিলে প্রচুর পরিমাণে ধন উৎপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু কেহই সে চেষ্টা করে না। বর্ত্তমানে ভারতের ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অধিকাংশই আবশ্যকে লাগে; অতি অল্প অংশ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই বাণিজ্য চলিতেছে। সে বাণিজ্যকেও বাণিজ্য বলিতে পারি না, কারণ তাহা ব্যবসা বিশেষ। কৃষকের উৎপন্ন বিদেশীয় বণিকের হস্তে প্রদান করাকে ব্যবসা বই আর কি বলিব? যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোকমণ্ডলী প্রাণপণে, অহঙ্কার, মান, মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত না হইবেন,—জমির উন্নতির চেষ্টা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। উৎপন্নের অংশ বৃদ্ধি না হইলে কখনই ধন বৃদ্ধি হয় না। তজ্জন্যই আমরা বলি, প্রথমতঃ উৎপন্নের মূল কৃষির উন্নতি সাধনে সকলেরই যত্ন করা উচিত, তারপর বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যতা লাভ করা যাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, কেহই আজ পর্য্যন্ত এই প্রকৃত ধন উৎপন্নের মূল্যের দিকে ফিরিয়াও দেখেন না। কাজেই বলি, এ দেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত।

মূল ধন ব্যতীত উৎপন্ন অসম্ভব, কারণ উৎপন্নকারী পরিশ্রমীদিগের ভরণ পোষণ কার্য্য এই মূলধনই সমাধা করে। কতক টাকা এতদর্থে ব্যয় না হইলে উৎপন্নের সম্ভাবনা কোথায়? এবং এতদর্থে যে অর্থ সঞ্চিত থাকে, তাহাই মূল ধন।* বিলাস-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা মূলধন

* "That the capital of a country is that portion of its wealth which is appropriated to reproductive purposes. But if wealth is so appropriated, it must be employed in assisting those who produce wealth. But the producers of wealth are the labourers, therefore capital remunerates the labourers; or, in other words, the capital of the country is the fund out of which the labourers are paid their wages." H. Fawcett's Pol. Eco.

নহে, কারণ তাহাতে উৎপন্নের সহায়তা করে না। অনুৎপাদক শ্রমের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাও মূলধন নহে, কারণ তাহা কেবল শ্রমজীবীদিগের ভরণ পোষণেই নিঃশেষিত হয়। উৎপাদক শ্রমের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাই মূলধন; কারণ একদিকে যেমন তাহাতে শ্রমজীবীদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়, সেই প্রকার আবার মুলধন সৃজনের সহায়তা করে।

বাণিজ্য কি, এই কথা বলিতে গিয়া আমরা আরও কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম। বাণিজ্য দ্বারা দেশের অভাব বিমোচন হয় সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে যে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে, এ কথা আমরা ভুলিতে পারিব না। স্বভাবের যে সকল দ্রব্যাদি ব্যতীত মানবের জীবন সংস্থান অসম্ভব, সেই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে বাণিজ্যের বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, নচেৎ কেবল বিলাসের জন্য—(যে কারণে আধুনিক বাণিজ্য এত প্রসিদ্ধ) বিনিময় করিলে কখনই উভয় পক্ষের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় না, বরং প্রকৃত পক্ষে দেশেব অনেক প্রকার অমঙ্গল ঘটে। এই প্রকার বাণিজ্য দ্বারা দেশ বিশেষ বা জাতি বিশেষ যে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু পক্ষান্তরে অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলে, অন্য দেশ বা জাতির অবনতি দেখিলে, হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে!! ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের তুলনা করিলেই আমরা এ তর্ক মীমাংসার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাই। দিন দিন ভারতবর্ষ একেবারে অর্থ-শূন্য হইয়া পড়িতেছে! এই মহা প্রদেশের অর্থ যাইয়া ইংলণ্ডে রাশীকৃত হইতেছে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ে পারদর্শী লোক নিতান্ত অল্প; এমন স্থলে বর্ত্তমান-প্রচলিত বৃটিশ আদর্শের বাণিজ্য ছাড়িয়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় কোন ফল হইবে কি না, সন্দেহ স্থল। এই জন্যই আমরা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা বলিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

বাণিজ্য দুই প্রকার—অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য। অন্তর্বাণিজ্যে যে সকল উপকার লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা বহির্বাণিজ্যের উপকারের পরিমাণ অধিক; কিন্তু তুলনায় বিপদের আশঙ্কাও অনেক। অন্তর্বাণিজ্য কিম্বা ব্যবসায়ে অভাব দূর হয় বটে, কিন্তু দেশের অর্থ বৃদ্ধি হয় না; কৃষি এবং শিল্পে মূলধনের যে অংশ বৃদ্ধি করে, তাহাই থাকিয়া যায়। অন্তর্বাণিজ্য দেশ মধ্যেই প্রচলিত থাকে, এই জন্যই এই বাণিজ্যের নাম 'ব্যবসা।'

বহির্বাণিজ্যে প্রকৃত পক্ষে অন্য দেশের অর্থ আনিয়া দেশের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু বহির্বাণিজ্যে সুখ, দুঃখ, উভয়ই সমান।

প্রাচীন কালে কোন্ স্থানে এই বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইতিহাস সকল সময়ে উত্তর করিতে সক্ষম নহে। বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলেই আমাদিগকে ইউরোপের সাহায্য লইতে হয়। কারণ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক দীপ্তি থাকিলেও তাহাতে কোন উপকার হয় না। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে অস্মদ্দেশীয় পুরাবিদ্‌পণ্ডিতগণ বাণিজ্যের সপক্ষে দুই চারিটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। এক শত বৎসরের একটী ঘটনা, দ্বিতীয় শত বৎসরের আর একটী ঘটনার সহিত সংযোগ করিয়া, ইতিহাসের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। আর সে সকল বৈদ্যুতিক দীপ্তি থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্তও কোন প্রকার বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। তবে আমরা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল কথার উল্লেখ করিয়া থাকি,সে সকল কেবল ভারতবর্ষের পুরাকালীয় বাণিজ্যের চিহ্ন স্বরূপ। শ্রীমন্ত সওদাগর একবার সমুদ্রে ডিঙ্গা ভাসাইয়া ছিলেন, একথা সকল স্থানেই শুনিয়া থাকি। বালিতে হিন্দুধর্ম্ম এবং শ্যাম ও চীন প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, এ সকল কথাও আমরা জানি। কিন্তু জানিয়াও প্রকাশ্যে বলিতে ইচ্ছা করে না। ভারতবর্ষে পুরাকালের 'বাণিজ্য' এই তিনটী কথার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কতদূর সম্বন্ধ, তাহা হইতেই আমরা সে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। পুরাকালে কোন প্রকার ব্যবসা প্রচলিত না থাকিলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপদেশের কথা আমরা শুনিতে পাইতাম না। তবে কথা এই, ভারতবর্ষে কোন্ প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল? তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্তর্বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধি হয় না। তবে পূর্ব্বে কেবল অন্তর্বাণিজ্য এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিলে, বাণিজ্যের প্রতি এত সমাদর কখনই থাকিত না। বহির্বাণিজ্য ভিন্ন অর্থ বৃদ্ধি হয় না। যাহা হউক, ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করা তত সহজ ব্যাপার নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী * অনুসন্ধান

* প্লিনি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে।

করিয়া ঠিক করিয়াছেন,—ভারতবর্ষের বাণিজ্য স্পেন প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহার প্রমাণ সকল আজ পর্য্যন্তও বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। যাহাই হউক, ভারতবর্ষীয়েরা যে বাণিজ্যের আদর বুঝিতেন, তাহা ঐ এক শ্লোকেই প্রমাণ করে। এমন কি, তাঁহারা বাণিজ্যের গুণ-কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া কৃষি ধনোৎপাদনের মূলাধারকেও দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন।

দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞ।*

আগামী ১লা জানুয়ারি, বৎসরের প্রথম দিনে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত বৃটনে বসিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন মহানগরী দিল্লিতে, 'এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া' ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিবেন, এই ঘোষণায় কেবল দিল্লি নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ রাজের সাধনার ফল, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা এতদিনে সম্পূর্ণ হইল! অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে, ইংলণ্ডবাসী যে মন্ত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে, শত সহস্র বাধা বিপত্তির পরে, আজ সেই মন্ত্র সাধনার উৎকৃষ্ট ফল ফলিল! দিল্লির সম্রাটগণ যাহা করিতে সক্ষম হয়েন নাই, মোগল, পাঠানগণ যাহা করেন নাই, বিদেশীয় যোদ্ধৃপুরুষগণ যে কীর্ত্তি-ধ্বজা ভারতবর্ষে উড়াইতে সক্ষম হয়েন নাই, আজ ইংলণ্ডবাসী—সেই পূর্ব্বতন বণিকদিগের মন্ত্রের যথার্থ সুখপ্রদ পুরস্কারে অধিকারী হইতেছে। ইংরাজ মহলে আনন্দের সীমা নাই, ইংলণ্ডের আজ একটী দিন!!!

আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ—আজ পৃথিবীর উচ্চাভিলাষ সকল ক্রমেই রাজনীতির নিগূঢ়তম প্রদেশে যাইয়া আবদ্ধ হইতেছে, পৃথিবীর সকলেই রাজনীতি রূপ মহামন্ত্র পরিগ্রহ করিয়া, তাহারই সাধনায় রত রহিয়াছে। আজ পৃথিবীর সকল শ্রেণীর লোকেই রাজনীতির মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্বীয় স্বার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত! আমাদিগের মহারাজ্ঞীর নূতন উপাধি গ্রহণের মধ্যে যে কি রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব রহিয়াছে, সে কথার উল্লেখ করিবার জন্য আমরা লেখনী ধরি নাই। যে মহানগরীতে পূর্ব্বতন আর্য্যগণ রাজসূয় যজ্ঞের সূত্রপাত করিতেন, যেস্থানে একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন শোভা পাইতেছিল, আজ সেই স্থানে বিদেশীয়, বিজাতীয় রাজার নাম

* ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারত সুহৃদ্ পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ঘোষিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত করিবে, এই সকল মর্ম্মভেদী কথা স্মরণ করাইয়া উদ্দীপনা করিবার জন্তও আজ আমরা এই প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন করিতেছি না। ভারতবর্ষ—যেমন আছে, তেমনি থাকিবে; ভারতবর্ষ রাজনীতির উচ্চ আসনের যোগ্য নহেন, এই কথা যখন আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তখন হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে যে মর্ম্মভেদী দুঃখ নিঃশ্বাস আপনা আপনি বহির্গত হয়, আমরা সকল সময়ে তাহা থামাইতে সক্ষম হই না। আজ দিল্লির দরবার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলাও আমাদের হৃদয়ের দুঃখ নিঃসরণ মাত্র।

ভারতবর্ষ চিরকাল রাজভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। বহুকালব্যাপী ভারতের ইতিহাসে রাজবিদ্রোহের কথা কোথাও দেখা যায় না। বিজাতীয় রাজার প্রতি ভারতবাসীর প্রগাঢ় ভক্তি চিরদিনই লক্ষিত হয়। একথা বুঝাইবার জন্য আর বিশেষ কোন চেষ্টার আবশ্যক করে না। কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারত যে জয় ঘোষণায় ব্যাপৃত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ! শত সহস্র নির্যাতনেও ভারতবাসীর মন বিচলিত হয় নাই—হইবার নহে। বৃটীশরাজা এ ভক্তির অনেক উদাহরণ পাইয়াছেন; কিন্তু পাইয়াও যে প্রকার কঠোর শাসন দ্বারা দুর্ভাগ্য ভারতবাসীদিগকে নির্যাতন করেন, সে সকলও একাল পর্য্যন্ত সহ্য হইয়া আসিতেছে। আজকাল অনেক সংবাদ পত্রে অনেক রাজনীতির কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে,—রাজনীতি সম্বন্ধীয় অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা কেবল মাত্র কথায়ই শেষ হয়। এটী ভারতবাসীর পক্ষে না হউক, ইংলণ্ডের পক্ষে শুভলক্ষণ বটে। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান দরবার সম্বন্ধেও অনেক কথা অনেক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম—অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় সম্পাদকগণও এই সময়ে নিরানন্দের সাজ পরিয়া, বর্ত্তমান যজ্ঞে ভারতের সুখ নাই, ইহার উদাহরণ দেখাইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় নিমন্ত্রণ পত্রে গৌরবান্বিত হইয়া, আহ্লাদিত মনে, দিল্লি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কাজেই বলি, ভারতবর্ষের রাজনীতি আজ কাল উপহাসের হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও মন্ত্র পরিগ্রহ নাই,—কাহারও সাধনা নাই। কথার কথা না বলিলে নয়, তাই ভারতে রাজনীতি—রাজবিরুদ্ধে লেখনী চালন! জ্ঞান-শূন্য ভক্তিপ্রধান দেশে উন্নতির আশা বিফল!

জ্ঞান কৌশলময় রাজনীতিতে আর ধর্ম্মের এক অঙ্গ অন্ধ ভক্তিতে চির-বৈষম্য বিরাজিত। যেখানে রাজনীতি, সেখানে অন্ধভক্তি থাকিতে পারে না, আবার অন্ধভক্তির মধ্যেও রাজনীতির কপট মন্ত্র প্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ চিরকালই অন্ধ ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, তবে আজ কাল যে রাজনীতির উদ্দীপনার সূত্রপাত হইয়াছে, সে কেবল কথার কথা। কালে, এই বীজে যে কি ফল উৎপাদন করিবে, তাহা যাঁহারা ভাবী কালের মধ্যস্থিত ফলাফল গণনা করিতে সক্ষম, তাঁহারাই বলিতে পারেন। ভারতবর্ষে পুর্ব্বের সে গৌরব নাই—সে রাজা নাই—সে রাজনীতি নাই—সে কবি নাই—সে কবি-কানন নাই, এ সকল কথার উল্লেখ করিয়া যে সকল যুবক মস্তক বিলোড়িত করিতেছেন, তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ সকল ঠিক থাকিলে, একদিন তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন। মনের একটী স্বাভাবিক শক্তি আছে,—সে শক্তি শিক্ষায় প্রস্ফুটিত হইলেই মন্ত্র পরিগ্রহ আবশ্যক হইয়া পড়ে; আজ কাল ভারতবাসীরা যে সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন, এ সকল কেবল তর্কের কথা বই, আজ পর্য্যন্তও কিছুই নহে; কারণ কার্য্যকালীন প্রায়ই সে মন্ত্র রক্ষা হয় না। স্বায়ংকালে যে মন্ত্র গ্রহণ করি, রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, যখন আর সে মন্ত্র ঠিক রাখিতে সক্ষম হই না, তখন আর মন্ত্র গ্রহণের সার মর্ম্ম আমরা কি বুঝিয়াছি? আজ যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাল যখন আবার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হই না, তখন আমাদের প্রতিজ্ঞায় কি ফল ফলিবে? কল্য আমরা উচ্চৈস্বরে বলিয়াছি—বর্ত্তমান দরবারে আমাদের সুখের কিছুই নাই, কিন্তু দুই দিন না যাইতেই, আমরা আবার আহ্লাদে উন্মত্ত হইবা তাহাতে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি! কি আশ্চর্য্য! যুবকবৃন্দের কথা দূর হউক,—দেশের বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়েরাও যখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, তখন আর আশা কোথায়? আর যদি বুঝিয়াছিলাম যে আমাদিগকে এই প্রকারই করিতে হইবে, তবে লেখনীর দ্বারা দুঃখের কাহিনী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার না করিলে, কি ক্ষতি ছিল? ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে,--আর ভবিষ্যতে যাহা আছে, তাহা ঘটিবে; সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া বৃথা দুঃখ প্রকাশ না করাই শ্রেয়। তবে কথা এই, দিল্লির রাজস্যূয় যজ্ঞে ভারত অঙ্গ ঢালিয়া নৃত্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন কেন? যাহাতে আমাদের স্বার্থ আছে, তাহাই আদরের এবং তাহাতেই আমরা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকি; কিন্তু বর্ত্তমান যজ্ঞ অধি-

ছানে আমাদের স্বার্থনাশ বই, স্বার্থ সিদ্ধির আশা কোথায়? একথা লইয়া দিন কয়েক নানা স্থানে অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আমরা আজ আবার এই প্রশ্ন তুলিলাম। আমাদিগের মন আছে, সহানুভূতির জন্য, ইন্দ্রিয় আছে, সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করিবার জন্য। আমরা বর্ত্তমান দুঃখের সময়,—স্বার্থনাশের সময়, দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, আহ্লাদের বেশে সজ্জিত হইতেছি কেন? সুখ, দুঃখ আমাদের প্রত্যেক দিনের ঘটনীয় ব্যাপার। স্বার্থনাশই জীবনের দুঃখ, স্বার্থসিদ্ধিই সংসারের সুখ। আজ মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, সাগরের পারে বসিয়া, ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার সাধনার বলে তিনি অলৌকিক লীলা খেলায় মত্ত হইয়াছেন, তাঁহার মনের ভাব কি, তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই; আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে কি না, তাহা আজ পর্য্যন্তও ভবিষ্যতের কালগর্ভে নিহিত, কিন্তু যে সকল স্বার্থের পথে কণ্টক পড়িতেছে, তাহা প্রত্যহ নয়ন উন্মীলন করিয়া জ্ঞাননেত্রে দেখিতেছি, বুঝিতেছি, তবে আমাদের হর্ষের কারণ কি? ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজ্ঞী, তাঁহার শাসনে ভারতের অনেক অভাব দূর হইয়াছে। তাঁহার নিকটে ভারত অনেক বিষয়ে ঋণী, সুতরাং তাঁহার উন্নতিতে ভারতের আনন্দ বই বিষাদ নহে! কিন্তু স্বার্থত্যাগ করিয়া কে কবে পরের উন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছে? জ্ঞান-শূন্য ধর্ম্মের উদাহরণ আমরা এস্থলে গ্রহণ করিব না। কোন্ রাজনীতিজ্ঞ স্বীয় স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের উন্নতিতে নৃত্য করিয়াছেন? ভারতের বর্ত্তমান ত্যাগ-স্বীকার সামান্য নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন এই স্বার্থ-নাশের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। চিরকাল—চিরদিন ইতিহাসে লেখা থাকিবে; যদি ভারত কখনও স্বীয় মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হয়, তখনও এই স্বার্থত্যাগের কথা,—বিজাতীয় গৌরব অপনীত হইবে না!

মহারাণীর নূতন উপাধি গ্রহণেও ভারতের সুখ আছে। দুঃখের কথা আমরা এখন স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিব না। ভারতের সুখ? কি আশ্চর্য্য কথা! ভারত চিরকাল ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রসিদ্ধ, আজ সেই ত্যাগস্বীকারের উৎকৃষ্টতম উদাহরণেও ভারতবাসীর মন বিচলিত হইতেছে না, এ কথা অজ্ঞান ধার্ম্মিকের নিকট সুখের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতিজ্ঞেরা কখনই ইহাকে সুখের বলিবে না। যখন নূতন উন্নতিশীল আমেরিকা,—নবোত্থিত জর্ম্মানি উচ্চৈস্বরে বলিবে "এই পৃথিবীতে যাহারা রাজনীতির কপট মন্ত্রে আজ পর্য্যন্তও দীক্ষিত না হইয়া, অকাতরে স্বীয়

রাজ্যের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক বটেন,—তাঁহাদের সহিষ্ণুতা যথার্থই আছে; এবং আজ ভারতবর্ষ দায়ে পড়িয়া যে ত্যাগ-স্বীকারেও আমোদে উন্মত্ত হইয়াছে, এ ত্যাগস্বীকার রাজনীতির অপরিপক্কতা হেতু ধর্ম্ম-ভাবের স্পষ্ট উদাহরণ, তখন আমরা, ভীরু বাঙ্গালী, যাহাদের রাজনীতি কেবল কথায় আবদ্ধ, এ সুখের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারিব।* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞান-শূন্য ধর্ম্ম আর জ্ঞানময় রাজনীতি এক স্থানে থাকিতে পারে না। জ্ঞান ছাড়িয়া ধর্ম্ম চাও, ত্যাগ স্বীকার কর। জ্ঞান লাভের জন্য রাজনীতি চাও, স্বীয় স্বার্থ নাশে কখনই সুখী হইও না। ভারতবর্ষ ত্যাগ স্বীকারেও সুখী, ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ; তবে ভারতবর্ষে আবার রাজনীতির আন্দোলন কেন? যেখানে ত্যাগস্বীকারে সুখ আছে—সেখানে রাজনীতি থাকিতে পারে না। তবে বৃথা মনে একভাব, বাহিরে আর এক কথা বলিয়া চিৎকার করিলে কি হইবে? জর্ম্মানি—আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,—দেখিবে, স্বার্থ-নাশে অন্তর পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যাইবে। এক কথায়, জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম চাও ত ভারতবর্ষ ছাড়িও না; আর রাজনীতিজ্ঞ হইবার অভিলাষ থাকিলে যত শীঘ্র পার, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইউরোপ এবং আমেরিকায় গমন কর; ভারতবর্ষ রাজনীতির স্থান নহে। ভারতবর্ষে যদি সুখ থাকে এবং বর্ত্তমান রাজসূয় যজ্ঞে যদি বাস্তবিকই সে সুখের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, সে সুখ এই জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ধর্ম্মভাব হইতে উঠিয়াছে। কিন্তু সময়ের যে প্রকার গতি দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, ভারতে এখন আর সে প্রকার জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ধর্ম্মভাব নাই; তবে আমরা কেন অকারণ আহ্লাদে মত্ত হইয়া উঠিতেছি? বৃটিশ শাসন পরম সুখের হইলেও, ইংরাজের জাতীয় পক্ষপাতীতায় ভারতের যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমাদের ক্ষমতা নাই, সে এক কথা; ক্ষমতা নাই, সহ্য না করিয়া কি করিব, সেও আর এক কথা। সহ্য করিতেছি, করিব [illegible]য আগুন অন্তরে অহর্নিশ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে আগুন নিবিবে না—নিবাইবার ক্ষমতা

* মহাত্মা গ্লাডোষ্টোন সাহেব একজন উচ্চ রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার প্রতিবাদে মহারাণী বিলাতের সম্রাজ্ঞী উপাধি পাইলেন না, কিন্তু ভারতবর্ষে কথা বলিবার লোক নাই বলিয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী হইলেন। এখানে মানুষ থাকিলে ইহারও তীব্র প্রতিবাদ হইত।

আমাদের নাই। কথা বলিলে মুখবন্ধ করিতে পারে, তাহা জানি। বিগত দুই বৎসর হইতে যে আইনগুলি, যে যে বিষয় উপলক্ষে প্রচারিত হইল, তাহাও জানি;—জানিয়া চুপ করিয়াই থাকিতে ইচ্ছা করে; কথা বলিতে সাহস হয় না—ইচ্ছাও করে না। যাঁহাদের মনে অহর্নিশ আগুন জলিতেছে—তাঁহাদিগের আবার বাজিরে হাসি কেন? একথা আমরা বুঝিতে পারি না।

আজ ভারতবর্ষে কাহার মনে সুখ আছে? কাহার না অন্তরে আগুন জলিতেছে? শৈশব অবস্থা লোকের কত দিন থাকে? এক কথায় আজ ভারতের সকলই ঘোর বিষাদে সমাচ্ছন্ন। অন্য কথা সমূহ দূর হউক, অন্য কথার উল্লেখ করিব না। সে দিন পূর্ব্ব বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ লোক হঠাৎ জলে ভাসিয়া গেল, এবং এখনও অস্বাভাবিক রোগে ও অন্নাভাবে কত লোক প্রাণে বঞ্চিত হইতেছে। বোম্বে মান্দ্রাজে শত সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, এ সকল যাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ নাই! বালকদের কথা ছাড়িয়া দেও,—নির্ব্বোধদিগের কথা উদাহরণে আনিও না; দেখ ত কত সহৃদয় বিজ্ঞলোকের মন ব্যাকুল হইয়াছে। অন্তরে এত দুঃখ থাকিতেও আমরা সদাই আনন্দে থাকিতে অভ্যাস করি, এটা আমাদের দোষ নহে, কার্য্যে ঘটায়; বিপরীত ভাব ধারণ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহাও জানি; কিন্তু তত্রাচ বলি,—সমস্ত ভারতবর্ষ যদি এই সময়ে বিষাদে অবনত থাকিতে পারিত, তাহা হইলে ইহার যে দৃশ্য হইত, সে দৃশ্য প্রার্থনীয়, সে সহৃদয়তা চির বাঞ্ছনীয়। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ যদি সমতানে, এই স্বার্থনাশের সময়, ক্রন্দনের ধ্বনি আকাশ স্পর্শ করাইতে পারিত, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মানি, ফরাশি বুঝিত, ভারত রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। আজ যদি সমস্ত ভারত দুঃখের বেশ পরিধান করিতে পারিত, তবে জগৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া অবাক্ হইত, ইতিহাসে এই কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিত।

দৈব বিড়ম্বনা ব্যতীতও শত সহস্র স্বার্থ নাশের কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু রাজার এই সুখের সময় আমরা ভাবী অনিষ্টের গান গাইব না, ভারতবাসীরা বুঝিতে পারেন, বুঝিবেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহাতে কাহারও ভাবী সুখের আশা নাই। সিপাহি যুদ্ধের পর

কোম্পানির রাজ্য রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পিত হইলে আমরা যে প্রকার উপকারের আশা করিয়াছিলাম, এবং যাহা পাইয়াছি, ইহাতে তদপেক্ষা আরো কত কি পাইব—কত কি সহ্য করিব,—কে জানে? আজ দেশ যে আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে, এই আমোদের শেষ ফল যে চির ক্রন্দনে পর্য্যবসিত হইবে না, কে জানে? তত্রাচ ভারত হাসিবেই, কাঁদিবে না'! বিধাত, আমাদের এ বালকত্ব আর কত দিনে ঘুচিবে?

আমাদিগের অভাব।

উন্নতি, মানবের সংক্ষিপ্ত জীবনের একমাত্র আদর্শ,—সকলেই ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন; কিন্তু চরম উন্নতি কখনই মনুষ্য জীবনে ঘটে না। আশার বস্তু যত পাওয়া যায়, তত আরো পাইবার ইচ্ছা হয়,—বাঞ্ছিত দ্রব্য যত ভোগ করা যায়, তত আরো ভোগ-ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হয়;—ক্ষণকালের ভোগ উপভোগে, মানবের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। পক্ষান্তরে যাহার মন যে বিষয়ে অনুরক্ত, তাহার মনে সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই বলবতী। ধন, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ভালবাসা, শারীরিক এবং মানসিক বল—এ সকল যাহার জীবনে একবার দেখা দিয়াছে, তাহার মন এ সকলের প্রতি যত ধাবিত, অন্যের তত নহে। 'আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ সকল সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে'—এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। ধনীর আর ধন লাভে অভিলাষ নাই, বিদ্বানের আর বিদ্যালাভে পূর্ব্বের ন্যায় অভিরুচি নাই *, এ কথার অনুকূল প্রমাণ আজ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই। মনুষ্য, বাহ্যিক অবস্থা ও রীতি নীতি যতই উন্নত হউক না কেন, উন্নতির শেষ সোপানে অধিরূঢ় হইতে সক্ষম নহে। তবে এই পর্য্যন্ত, কেহ বা অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক উন্নত, কেহ বা কম উন্নত।

সমাজ, মনুষ্য মণ্ডলীর সমষ্টি মাত্র। যখন প্রত্যেক মনুষ্যের মনই আংশিক উন্নত, তখন অংশের সমষ্টি মূল সমাজও যে আংশিক উন্নত, তাহাতে আর সংশয় কি? পৃথিবীর সকল সমাজই কোন না কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ। হয়ত কোন কোন সমাজ অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত; কিন্তু কোন সমাজই

* বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ইহার বিপরীত।

সম্পূর্ণ উন্নত অবস্থায় আজ পর্য্যন্তও অধিরূঢ় হইতে পারে নাই—ভবিষ্যতে পারিবে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ আছে।

পৃথিবীর সমস্ত লোক সমুন্নত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সমূহে, সভ্যতা, রীতি, নীতির এত তারতম্য থাকিত না, সামাজিক আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা তিরোহিত হইত। নানা প্রদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আচার ব্যবহারে এত তারতম্য—এত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক দেশের সভ্যতা অপর দেশের অসভ্যতার লক্ষণ; এক দেশের জ্ঞান, অপর দেশের সামান্য শিক্ষা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা যে প্রকার আচার ব্যবহারকে সভ্যতার লক্ষণ মনে করি, অপর প্রদেশে হয়ত তাহাকে অসভ্যতা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে। সংক্ষেপে ব্যক্তিগত মত, সমাজগত আচার ব্যবহার পরস্পর এত বিভিন্ন যে, সরল চক্ষে, কোন্‌টী উন্নত বা কোন্‌টী অবনত, তাহা ঠিক করা যায় না। হয়ত আজ যাহাকে উন্নত অবস্থা ভাবিতেছি, তাহাও কালে অবনত বোধ হইতে পারে। গত জীবনের সকল কার্য্যের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, সকলেই এ কথা বুঝিতে পরিবেন।

অভাবের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং সেই অভাব দূরীকরণের ইচ্ছা ও চেষ্টাই জাতীয় উন্নতির লক্ষণ। অভাব জ্ঞাপনের সঙ্গেই অভাব বিমোচনের বাসনা হয়; কিন্তু চেষ্টা সকলের হয় না। যাহাদের চেষ্টা হয়, তাহাদের সেই অভাব বিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে আরো অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; আর যাহাদের চেষ্টা হয় না, তাহারা সমস্ত জীবন সেই অভাব বিশেষ লইয়াই অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়। যত অভাব দূর হয়—তদপেক্ষা অধিক অভাব আসিয়া মানব সমক্ষে উপস্থিত হয়। যত লোক পুণ্যবান হয়, ততই পাপ-বোধ বৃদ্ধি পায়। অনন্ত উন্নতির পথে অভাবের শেষ নাই, তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই, যে সমাজে অভাব হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টার সামঞ্জস্য আছে, সেই সমাজেই তত অভাব অধিক এবং সেই সমাজই তত উন্নত। *

কথা দাঁড়াইতেছে যে, উন্নত সমাজের অভাব অধিক। প্রকৃতপক্ষে ইহার

---

* অভাব দুই প্রকার। প্রথমতঃ পূর্ণ অভাব,—কোন বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞানের অতীত—অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আমরা জানি না এবং এ প্রকার অভাবকে আমরা উন্নতির লক্ষণ মনে করি না।

দ্বিতীয়তঃ—আংশিক অভাব—একটী বিষয় যখন আংশিক পরিমাণে জ্ঞানের সমক্ষে উপস্থিত হয় এবং অন্যান্য অংশ জ্ঞানের অতীত থাকে। এই আংশিক পরিমাণের অভাবকেই আমরা জাতীয় উন্নত অবস্থার লক্ষণ মনে করি এবং ইহা প্রায়ই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই দেখা যায়, মানসিক শক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়—পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিষয় ধারণে সক্ষম হয়। বাল্যকালে মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ থাকে, সেই বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে যখন সবল হইতে থাকে, তখনই চিন্তা শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে একটী বিষয় যে মন ধারণ করিতে পারিত না—একটী বিষয় যে মন চিন্তা করিতে পারিত না, সময়ে সেই মন শত সহস্র বিষয় চিন্তা করিতে পারে। চিন্তা শক্তির বৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য হইলে অভাব সকল আমরা জ্ঞাত হইতে পারি। এই দুইটির একটীর অভাবেও আমরা সকল অভাব জ্ঞাত হইতে সমর্থ হই না। এই জন্যই বয়ঃক্রম সহকারে যখন চিন্তা শক্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের অভ্যুদয় হইতে থাকে, তখনই একটী একটী অভাব বুঝিতে পারা যায়। এই সকল অভাব প্রাকৃতিক, ইহা প্রায়ই বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে মানব সমক্ষে উপস্থিত হয়, এবং এ সকল প্রায় সমস্ত জীবনেই ঘটিয়া থাকে। শরীর পোষণার্থ আহার, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয় দ্রব্য—শরীর আবৃত করিবার জন্য বস্ত্র, বিশ্রাম জন্য আবাস স্থান যে প্রয়োজনীয়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু কৃত্রিম অভাব সমূহ (অর্থাৎ যাহা বয়ঃক্রম অনুসারে সকলের মনে উপস্থিত হয় না) কেবল মানব মনের তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচালনার ফল মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা ও বিবেচনা শক্তি যখন গাঢ় হয়, তখনই এই সকল অভাব উপস্থিত হয়। পরিচালনা করিতে করিতে জ্ঞান-চক্ষু যত উন্নত হইতে থাকে, ততই জগতের অভাব সকল তীক্ষ্ণ প্রতিভার সমক্ষে উপস্থিত হয়। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অভাবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একটী অভাব দূর হইতে না হইতে আরো কত অভাব আসিয়া লোকেরও সমাজের উন্নতি-বিষয়ক অভাবের দ্বার মোচন করে। এ সকল অভাব অসভ্য জাতির নিকট অলীক স্বপ্নে পরিণত। উন্নতির শেষ নাই—সুতরাং অভাবেরও শেষ নাই।

দেশ কাল ভেদে নানা দেশীয় লোকের মন নানা বিষয়ে অনুরক্ত—সেই অনুরক্ত বিষয়ের বিভিন্নতাতে নানা দেশের রুচি নানা প্রকার;—বহু সংখ্যকের নিকট যে রুচি ভাল, সেই রুচিই ভাবী সমাজের বীজ স্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং এই বীজের আধিক্য অনুসারেই লোকমণ্ডলী, এবং সমাজ-সমূহ সভ্যতার উচ্চ পদে আরূঢ় হইয়া পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়। পৃথিবীর কোন্ সমাজে এই বীধ সংখ্যা অধিক এবং কোন্ সমাজ কত

উন্নত—সে বিষয়ের সমালোচনা আমরা করিব না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেশীয় লোকমণ্ডলীর প্রধান অভাবগুলি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা ১ম—শিক্ষাপ্রণালী; ২য়—জাতীয় একতা; ৩য়—বিজাতীয় অনুকরণে আসক্তি; ৪র্থ—দেশীয় পূর্ব্ব প্রচলিত আচার ব্যবহারের প্রতি অমনোযোগ; এই চারিটী বিষয়ের ঔচিত্যানুচিত্য প্রদর্শন করিব।

১ম। শিক্ষাপ্রণালী।—বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ইংরাজি স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া এম্-এ, বি-এ উপাধিধারী হইয়া সমাজকে উজ্জ্বল করিতেছেন। পূর্ব্বের প্রচলিত টোল্ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষা-স্থানের কথা এখন আর বড় শুনা যায় না। স্থানে স্থানে টোল ইত্যাদি থাকিলেও স্থানীয় লোক সকল প্রায়ই তাহার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; অনেকে সেই টোল সমূহের ছাত্র এবং অধ্যাপকগণকে ঘৃণা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ; গৌণ লক্ষ্য, অভাব দূর করা অর্থাৎ অর্থ উপার্জ্জন এবং সম্মান প্রাপ্তি। বর্ত্তমান শতাব্দীতে গৌণ লক্ষ্যকেই শিক্ষার প্রধান কারণ বলিয়া লোকেরা নির্দ্দেশ করিতেছে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-লাভ সংস্কৃত টোল প্রভৃতিতেও হইতে পারে, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ স্কুলেও হইতে পারে। কিন্তু একটীর প্রতি বর্ত্তমানের অনাদর, অন্যটীর প্রতি এত আদর কেন? অধ্যয়নেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরাজী কলেজের প্রতি সাধারণের এত আদর কেন? ইহার কারণ আমরা আর কিছু দেখি না। অর্থ উপার্জ্জন লক্ষ্য করিয়াই সকলে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং তজ্জন্যই বঙ্গীয় নব্য যুবকদিগের কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা এবং অধ্যয়নের পর্য্যবসান হয়।

বিদ্যাভ্যাসের প্রধান লক্ষ্য আজ কাল অর্থ উপার্জ্জন এবং রাজ-প্রসাদ লাভ; এই দুইটী কারণেই অনেকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য এত লালায়িত। যাহারা নির্ধন, তাহাদের মনে স্বতঃই অর্থের বাসনা বলবতী। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই এই দল শিক্ষা-পথের কণ্টক পরিষ্কার করিতে যত্নবান। আর যাঁহারা ধনী, তাঁহাদের মনে 'রাজপ্রসাদ' লাভের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং সমাজের এইদল প্রাণপণ করিয়া রাজ্-প্রসাদ লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষা ব্যতীত এ দুয়ের কিছুই লাভ করা যায় না, তজ্জন্যই আজ কাল বিদেশীয় শিক্ষার এত আদর। অন্য ভাষায়

এ দুয়ের একটীও লাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অন্য ভাষা চিত্ত-বিনোদিনী নহে। জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন দিন কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই; আমাদের দেশের লোক সেই উন্নতির মূল জাতীয় ভাষাকে ঘৃণার সহিত দেখিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সংস্কৃত যে উৎকৃষ্ট ভাষা, তাহা ইউরোপে প্রশংসা বাহির হওয়ার পর সকলেই স্বীকার করেন, অথচ ইহার প্রতিও অনেকেই তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'যে দুইটী কারণে বিদেশীয় ভাষার প্রতি লোকের এত আসক্তি জন্মিয়াছে; তাহা অধুনা কত দূর সঙ্গত, তাহাই দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষার ১ম উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যতীত আজ কাল কেহই গবর্ণমেণ্টের সরকারে চাকুরির যোগ্য নহেন; এইজন্যই সকলে একাগ্র মনে এই কঠিন উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই উপাধি লাভ করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। এ প্রকার উৎসাহ শিক্ষা পথের উত্তেজক, সন্দেহ নাই। লক্ষ্য বস্তুর প্রতি মনকে স্বতঃই ধাবিত করা উচিত, স্বীকার করি; কিন্তু সময়ে সময়ে যাঁহারা এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে না পারেন, তাঁহাদিগের প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা কেন? আবার যাঁহারা এ প্রকার উৎসাহজনক উপাধির অযোগ্য, তাঁহাদিগের মনেই বা কষ্ট হয় কেন? অর্থোপার্জ্জনের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ অতি অল্প। পক্ষান্তরে অর্থের পথ আজ কাল এত অপ্রশস্ত হইয়াছে যে, সমস্ত জীবন এই পথের অনুসরণ করিয়াও কেহ, কেবল জীবন ধারণ ব্যতীত, অন্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। তবে চাকুরির এত অভিলাষ কেন? কারণ এই, ইংরাজি শিক্ষায় আর কিছু হউক বা না হউক, সম্মান-প্রাপ্তি ও চাকুরির পিপাসা শতগুণে বৃদ্ধি পায়; তাই ইংরাজি শিক্ষার জন্য—উপাধির জন্য মানুষ এত লালায়িত। কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এজন্য লক্ষ্য বস্তু না পাইলে যে কষ্ট, তাহা অনেকেই সহ্য করিতেছেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রধান গুণ এই, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাস-প্রিয়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থ, বিলাস-প্রিয়তার চির সহচর। অর্থের পিপাসা কাজেই কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক। এই অর্থের পথে কত কণ্টক—কত অপমান—কত পদাঘাত! তত্রাচ ইহার প্রতিই সকলের মন ধাবিত। সমস্ত শরীর, মন ক্ষয় করিয়া যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারী হইলেন, অমনিই ২০৲ টাকার চাকুরি জুটিল—কত সুখ, কত আনন্দ-প্রবাহ! এই ২০৲ টাকার মধ্যে কত অপমান, কত পদাঘাত, তত্রাচ ইহাতেই সুখ।

লক্ষ্যের বস্তু এত ক্ষীণ—এত দুর্ব্বল, তথাপি এই পথেই হাঁটিতে হইবে! শরীর, মন ক্ষয় হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? সাবধান, কেহ পথ ছাড়িও না; যদি পদস্খলন হয়; তবে অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে! কি ঘৃণার কথা! বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোকের অন্য দিকে মন নাই—অন্য বিষয়ে ভাবনা নাই—কেবল এই এক চিন্তা,—এই এক সার জ্ঞান! এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক লক্ষ্য, এক পরিণাম। মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা, বীরত্ব, দেশের উন্নতি সাধন, বাণিজ্য, একতা, এ সকল কে ভাবিতে বসিবে? ভাবিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ হইবে না, ২০৲ কি ৫০৲ টাকার চাকুরি জুটিবে না! কি ঘৃণার কথা!! দেশের হীনাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কে জীবনের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইবে? যত্নবান হইলে কণিক-সেক্সনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুখে মুখে বলিতে পারিব না, ইহা যেন কৃতবিদ্যদিগের মূলমন্ত্র।

ইংরাজি শিক্ষায় বিলাসের জন্য যে অর্থের পিপাসা বৃদ্ধি হয়, সে পিপাসা নিবারণের উপায় দিন দিনই বন্ধ হইয়া আসিতেছে; আবার এমনি কর্ম্মের ভোগ, যিনি একবার ইংরাজি শিখিয়াছেন, তাহার মধ্যেই আত্মগরিমা উপস্থিত, তিনি আর ফিরিয়া স্বদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ে, চাষবাসে নিযুক্ত হইতে পারেন না। তজ্জন্যই দেশীয় ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি প্রকৃত অর্থের সোপান সকল দিন দিন ঘৃণার্হ হইতেছে এবং তজ্জন্যই বাণিজ্যের এত দুরবস্থা। সময় সময় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা ত কাহারও মনে নাই; অর্থের পথে এত বাধা বিপত্তি, তবুও এ পথে লোকে এত আদরের সহিত অগ্রসর হয় কেন? যে ইংরাজি শিক্ষায় চাকুরির পিপাসা শত-গুণে বৃদ্ধি পায় এবং তাহা নিবারণের উপায় নাই—সে শিক্ষার ফল কি? শিক্ষা কিসের জন্য? পরের পদে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিবার জন্য? দাসত্বের জন্য? বিলাসপ্রিয়তার জন্য? কি ঘৃণিত কথা। আশার বস্তু না পাওয়া গেলে মনে যে কষ্ট হয়, তাহা কাহার মনে না জাগিতেছে? কিন্তু তথাপি ইহাতে সুখ! দেশীয় দ্রব্যাদি অপরে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়—আমরা অর্থ উপার্জ্জনের উপায় অন্বেষণ করিবার জন্য পরের পাদুকা মস্তকে বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছি! ইহাতেও মনে বিকার নাই; কারণ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী!! দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, রাজপ্রসাদ লাভ। আমাদের দেশীয় ধনী লোক মাত্রেই, সাহেবের প্রিয় হইবার মানসে ইংরাজি ভাষার প্রতি এত আসক্ত। বাস্তবিক রাজপ্রসাদ লাভ যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

ইংরাজি শিখিয়া সাহেবের প্রিয় হইবার আশা কখনই পূর্ণ হইবার নহে। কারণ, নৈসর্গিক তারতম্যে মানবের স্বরের মধ্যে যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, তাহা কেহই পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহেন। পক্ষান্তরে "বাবু-ইংরাজির" প্রতি সাহেবদিগের এত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে, তাহাদিগের প্রিয় হইবার আশা সুদূরপরাহত। ভাষা, মনুষ্যমণ্ডলীর মনোভাব ব্যক্ত করার শব্দ সমষ্টি মাত্র। সৃষ্টির প্রারম্ভে এ শব্দ প্রায়ই এক রকম ছিল; বর্ত্তমানে মানব স্বরের লক্ষ্য (শব্দের) যে সকল বিভিন্নতা আছে, তাহা কেবল ভিন্ন দেশীয় নৈসর্গিক অবস্থার পরিচায়ক। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা, বিভিন্ন ভাষার অনেক শব্দই যে মূলে একরূপ, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে কথা সমূহ যতই বিভিন্ন হউক না কেন, আদি স্বরের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক ভাষায় শব্দ সকলের মধ্যে অতি অল্প বিভিন্নতা দেখা যায়। বর্ত্তমানে পূর্ব্বের স্বর অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; রুচি এবং স্বরের তারতম্যে নানা দেশর ভাষা নানা প্রকার হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ধনী যুবকগণ বর্ত্তমানে রাজপ্রসাদ লাভাশায় স্বভাবের উপরেও হস্তক্ষেপ করিতে অভ্যাস করিতেছেন। দেশীয় স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরাজি স্বরে পরিণত করিবার ইচ্ছা অনেকেরই হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাতে ইংরাজি এবং বাঙ্গালা, দুই ভাষার উৎকর্ষ সাধন হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন। তাঁহাদিগের ভাষা 'না ইংরাজি না বাঙ্গলা' গোছের হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক,—এই ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী শুভ লক্ষণ এই, অর্থই হউক কিম্বা রাজপ্রসাদ লাভাশায়ই হউক, অনেকেই শিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। এ শিক্ষায় আমাদিগের উপকারও অনেক হইতেছে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের দেশীয় শিক্ষার পথে যে দুইটী প্রধান অভাব রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়াই শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে অভাব দুইটী, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়।

ইতিহাস। মানব প্রকৃতি দৃষ্টান্ত মূলক। অন্যান্য ইতর প্রাণিগণের মধ্যে যে সকল সাধারণ স্বভাবগত প্রতিভা দেখিতে পাওয়া যায়; মনুষ্যের মধ্যে সে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য পশু পক্ষীকে আশৈশব গৃহপিঞ্জরায় আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের স্বজাতির আচার, ব্যবহার হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিলেও, তাহাদের জাতীয় স্বর, জাতীয় আহার, জাতীয় কুলায় নির্ম্মাণ পটুতা ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রম জন্মে না। পক্ষীকে যত ভাল অবস্থায়ই

পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা যা'ক্ না, তাহাদের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকে, এবং একটু ফাক্ পাইলেই পলায়নের জন্য অস্থির হয়। ব্যাঘ্রকে শৈশব সময় হইতে ঘরে রাখিলেও, উপযুক্ত বয়সে তাহাদের রুচি মাংসের প্রতি ধাবিত হয়; এবং 'মাতৃলম্ফ' প্রদান করিয়া শিকার করণ প্রথা মনে উপস্থিত হয়। এ সকল তাহাদিগকে শিখাইতে হয় না, আপনা আপনিই মনে উদয় হয়, ইহাকে ইতর প্রাণীর স্বাভাবিক প্রতিভা (instinct) বলে। কিন্তু মনুষ্যের সে প্রকার নহে। অতি শৈশব অবস্থায় লোক-সমাজ হইতে শিশুকে অন্ধকারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহাদিগের প্রকৃতি, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে। দেখা গিয়াছে, ভল্লুক-প্রতিপালিত মানব-শিশু ভল্লুক-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, বাল্যাবস্থা হইতে সন্তানেরা অনুকরণ করিয়াই উন্নত হয়; তাহারা অল্পবয়সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই অভ্যাস করে। এই অনুকরণ-ইচ্ছা বাল্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবনের অবলম্বন। যে সমাজে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত, তাহাই অনুকরণের আদর্শ। দেশ কাল তারতম্যে সন্তানগণের মধ্যে যে সাধারণ বৈষম্য দেখা যায়, সে সকল পরিত্যাগ না করিলেও, বুঝা যায়, দেশীয় দোষ গুণ ভিন্ন অন্য কিছু লইয়া সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করে না। সাময়িক লোকেরাই সন্তানগণের উন্নতির বা অবনতির আদর্শ; অতএব সামাজিক লোকের রুচি এবং চরিত্র উন্নত হইলে যে তাহাদিগের রুচি ও চরিত্র উন্নত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এই জন্যই আমরা বলি, শিশু সন্তানদিগকে ভাল ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মনুষ্যত্বের উপযোগী করা উচিত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সন্তানগণের জন্য কষ্ট করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের আচার ব্যবহার, রীতি, নীতির প্রতিও বর্ত্তমান সময়ে লোকদিগের তত মন নাই। পৃথিবীতে পাপের স্রোত এত প্রবল যে, অল্প সময়ের মধ্যে পবিত্রচেতা, কোমলমতি শিশু সন্তানদিগের চিত্তেও পাপ-রেখা অঙ্কিত হয়; অসাময়িক সংসারকীটে শরীর ও মনকে ক্ষত বিক্ষত করে। এ সকল বিষয়ে অভিভাবকদিগের একবারও দৃষ্টি পড়ে না। পূর্ব্বতন বিশ্বাস প্রযুক্তই হউক, কিম্বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কারণেই হউক, ভাবী ভারতের গৌরব স্বরূপ সন্তানদিগকে স্কুলের অগঠিত-চরিত্র শিক্ষক এবং বাড়ীর স্ত্রীলোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াই মনের শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

স্বীয় জীবনগত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সন্তানগণকে উন্নত করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, এই জন্যই অন্যান্য উপায় আদরণীয়। প্রতিভা-

শালী সৎলোকের জীবন-বৃত্তান্ত তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিতে দেওয়া উচিত। ভাল ভাল জীবনের উপদেশ-পূর্ণ ঘটনাবলী তাহাদিগকে আদর্শ স্বরূপ অভ্যস্ত করাইলে, তাহাদিগের কোমলমতি যে ক্রমে ক্রমে সেই দিকে আকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? অল্পবয়স্ক বালক-দিগের মন সরল এবং কোমল; তাহাদিগকে যে প্রকার নত করা যায়, সেই প্রকারই নত হয়; যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই প্রকারই শিক্ষিত হয়। এমন স্থলে, উন্নত জীবনের আদর্শের ছায়ায় রাখিলে, তাহাদিগের ভাবী উন্নত অবস্থার বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিতে পারেন না। কিন্তু এ প্রকার শিক্ষার জন্য কাহাকেও যত্ন করিতে দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ইতিহাসের আস্বাদন আজ পর্য্যন্ত কেহই পায় নাই। অন্যের জীবন পাঠ করিয়া, অন্য দেশীয় সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা করিয়া, অন্য দেশীয় স্বাধীন জীবনের সুখ অনুভব করিয়া, ভারতবর্ষীয়েরা আজ পর্য্যন্তও সুখ অনুভব করিতে শিক্ষা করেন নাই। শিশু সন্তান হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলেরই অন্যের জীবন পাঠ করিলে কিছু শিক্ষা করিবার থাকিতে পারে। শিক্ষার এ সারতত্ত্ব আজ পর্য্যন্তও এদেশের অনেকেই বুঝিতে সক্ষম হন নাই। অন্য জাতির দৃষ্টান্ত ব্যতীত জাতীয় উন্নত অবস্থা স্বপ্নের ন্যায়; কিন্তু ভারতবর্ষে এ দৃষ্টান্ত ভ্রান্তি-মূলক। অনেকেই, ভারতের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে, ভারতকে প্রকৃত উন্নত অবস্থাপন্ন ভাবিয়া, মনে শান্তি ও সুখ লাভ করিতেছেন। অতি অল্প লোকই, জাতীয় উন্নতির ইতিহাস বিষয়ক অভাব-কণ্টক পরি-ষ্কার করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতে যত্নবান। অনেকেই 'ভারত উন্নত' হইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন; কিন্তু যে প্রদেশে ইতিহাসের চর্চ্চা একেবারেই নাই, যে প্রদেশ ইতিহাসকে জাতীয় উন্নতির অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করে না, সে স্থান উন্নত, কি প্রকারে স্বীকার করিব? সাহিত্য, অলঙ্কার, তর্কশাস্ত্র, গণিত, দর্শন, এ সকলের প্রকৃত আস্বাদন ভারতে অনেকেই পাইতেছেন। কিন্তু ইতিহাসের কথা কয়জনে ভাবিয়া থাকেন? ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহে কিছু২ ইতিহাসের চর্চ্চা হয় সত্য, কিন্তু কয়জন লোক ইতিহাস হইতে জ্ঞান লাভ করিবার মানসে, ইহা পড়িয়া থাকেন? পক্ষান্তরে ইতিহাসের স্থানে, অন্য কোন বিষয় ধার্য্য হইলে, অনেকের মনই আহ্লাদিত হইবে, ইহারও পূর্ব্ব লক্ষণ পাওয়া যায়। মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা, দৈনিক কাগজ, এ সকলের আর ভারতে

অভাব নাই, কিন্তু এ সকলের কয়খান কাগজে প্রকৃত ইতিহাসের চর্চ্চা থাকে? কোন কোন পত্রিকায় থাকিলেও পাঠকগণ সে অংশ পাঠ করেন না; একেবারে পরিত্যাগ করেন। ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রায়ই অপঠিত থাকে। সংক্ষেপে, ইতিহাসের আস্বাদন ভারতে আজ পর্য্যন্তও কেহই পায় নাই; পাইলে, অন্য কত প্রকার পুস্তক প্রচারিত হইতেছে, ইতিহাস হয় না কেন? অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে কোন ইতিহাস-লেখক ছিল না বলিয়াই, পূর্ব্ব গৌরব স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয় এবং সেই জন্য মনে ধিক্কার জন্মে। আমরা বলি, পূর্ব্বে ছিল না—সে কষ্ট আমরা অনুভব করিতেছি, কিন্তু ভাবী ভারত সন্তানগণের জন্য আমরা কি করিতেছি? আমাদের মধ্যে কয় জন লোক ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন? দেখিতে দেখিতে এই উনবিংশ শতাব্দীতে কত ঘটনা ঘটিল, কিন্তু এমনি কর্ম্মের ভোগ, ইহার বিবরণ ইংরাজি গ্রন্থ ব্যতীত আর কোথাও নাই। বিদেশীয়েরা আমাদের গৌরব লিখিতে কত দূর পটু, তাহা পলাশী যুদ্ধ এবং বিগত সিপাহি-বিদ্রোহ-বিবরণেই বিবৃত আছে। যে বিদ্রোহের কথা মনে পড়িলে, আমাদের মন সাহসে উদ্দীপ্ত হয়—এই নিরাশ মনেও আশার সঞ্চার হয়, সেই ঘটনাবলী কি না সংক্ষেপে দুই চারিটী ইংরাজের গৌরবে আরম্ভ হইয়া ইংরাজের গৌরবেই শেষ হইয়াছে! প্রকৃত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক থাকিলে, পলাসী সমর-কাহিনীতে সিরাজের মহত্ত্ব ও বীরত্ব এবং ইংরাজের কলঙ্ক অকথিত ভাবায় চিত্রিত হইত। সে সকল কথা দূর হউক। এই ভারতবর্ষে কত শত অলৌকিক গুণসম্পন্ন লোক, জন্মগ্রহণ করিয়া, অকালে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। হায়, তাঁহাদিগের রত্নপূর্ণ জীবন সময়ের গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে, কোন নিদর্শন থাকিতেছে না! এই সকল মহাত্মাদিগের কথা মনে পড়িলেও কত আশার অঙ্কুর জন্মে, কিন্তু, তাঁহাদিগের জীবনের কোন ঘটনাই পুস্তকাকারে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের জীবনে এত রত্ন ছিল যে, উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও মানুষ তাহা অনুকরণ করিতে পারিত। তাঁহাদিগের জীবনাভিনয় শেষ হইল—সময় স্রোত বহিয়া গেল—তাঁহাদিগের রত্নপূর্ণ জীবন সময়ের অভেদ্য জঞ্জালে ঢাকা পড়িল, কোন চিহ্ন রহিল না। দেখিতে দেখিতে ভারতে যে সকল অদ্বিতীয় লোক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তাঁহাদের জীবনে কি এমন কোন রত্ন ছিল না, যাহাতে ভাবী ভারতের উপকার হইত? কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভারতবাসী

তাহার মর্ম্ম বুঝে না, ইতিহাসে যে সকল উপকার হয়, তাহা জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না। রত্ন-প্রসূতী ভারতমাতা কত শত শত রত্ন প্রসব করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন, কিন্তু কয় জনের পূর্ণ জীবন-চরিত আমরা দেখিতে পাই? মানিলাম, অনেকের জীবনচরিত আছে, কিন্তু প্রধান প্রধান ঘটনা ব্যতীত জীবনের উত্থান পতন, প্রাত্যহিক ঘটনা সম্বলিত কয় জনের জীবন বৃত্তান্ত আছে? দৈনিক ঘটনা কয়জন ভারতবাসী নিয়মিত রূপে লিখিয়া থাকেন? আমাদের প্রদেশের লোকেরা এখনও দৈনিক ঘটনা-বলীর আস্বাদ পায় নাই; উহার মধ্যেই যে চরিত্রগত মহত্ব এবং উত্থান-পতন-ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা এদেশের লোকেরা বুঝেন না। তবে কেমন করিয়া পোড়ামুখে স্বীকার করিব, ভারত উন্নত হইয়াছে! বিজাতীয় গৌরব, বিজাতীয় বাহ্যানুকরণ ছটা পরিত্যাগ করিলে, দেখি, ভারত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; মনে হয় যেন ভারতসূর্য্য এখনও উদিত হন নাই। কেবল পর রত্নে স্বীয় ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া চীৎকার—আমোদধ্বনি করিলে কি হইবে, ভারত আজ পর্য্যন্তও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত জাতীয় অভাব দূর হয় না। বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য—শরীরের যাহা কিছু আবশ্যক, এ সকলই বিজ্ঞানের উন্নতির উপর নির্ভর করে। আবার অন্য কথা, স্বাধীনতা বা স্বাবলম্বন, তাহাত বিজ্ঞান ব্যতীত সাধিত হইতেই পারে না। কিন্তু এই বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি আদৌ হইতেছে না। কলেজের ছাত্রগণ যাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িলেন, অমনিই সব বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন দিলেন। যাঁহারা একটু যত্ন সহকারে বিজ্ঞান শিখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দ্বারাও দেশের উপকারের সম্ভাবনা নাই—কারণ বিস্মৃতি এবং স্বার্থের পথ ছাড়িয়া যদি দুই একটী লোক আসিলেন, তাঁহাদিগেরও ক্ষমতা নাই যে, আশু সমাজের কোন উপকার করিয়া উঠিতে পারেন। অর্থহীন উৎসাহী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি কি অর্থ ভিন্ন হইতে পারে? যাঁহারা ধনী, তাঁহারা দেশের কথা মোটেই ভাবেন না, বিলাসিনীর সেবাতেই সকল অর্থ ঢালিয়া কৃতার্থ হন। ভারতের কলেজ সমূহে এবং বিজ্ঞান সভায় যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়, তাহাতে কোন উপকারই হইতে পারে না, কারণ তাহাকে যথার্থ বিজ্ঞান না বলিলেও চলে; এমন স্থলে দেশের কি প্রকারে উন্নত অবস্থা হইবে, আমরা বুঝিতে পারি না। ভারতবাসীর মন দুর্ব্বল, সুতরাং বিজ্ঞানের গূঢ়তম

প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে চায় না। যে দেশে বিজ্ঞানের সমূহ চর্চ্চা নাই, সে দেশের অপেক্ষা আর হীনাবস্থ দেশ কোথাও নাই।

দ্বিতীয়তঃ। জাতীয় একতা। ধর্ম্মই জাতীয় একতার মূল। আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মেই দৃঢ়বিশ্বাস নাই। ধর্ম্ম বিশ্বাস, মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু কুশিক্ষার প্রাবল্যে স্বভাব-সিদ্ধ বিশ্বাস ক্ষণকাল মধ্যেই চলিয়া যায়, ইহা নব্য যুবকদিগের মূলমন্ত্র। ধর্ম্মহীনতাই চরিত্রহীনতার কারণ। চরিত্রহীনতাই একতার প্রতিবন্ধক। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, হিন্দু, এ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন লোক বলিয়া পরিগণিত। কাহারও প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা নাই, পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী। এই জন্যই ভারতবর্ষে, "ভাই ভাই কাটাকাটি।" ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ পর্য্যন্ত কেহই একতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে অনেক যুবকই স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষপাতী, ধর্ম্মের কথা শুনিতেও পারেন না; ইহার অপেক্ষা আর কি অধোগতি হইতে পারে? ধর্ম্ম ব্যতীত একতা থাকিতে পারে না; একতা ভিন্ন কে কবে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে? ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, যেখানে ধর্ম্মের একতা, সেই খানেই মনের একতা; যেখানে মনের একতা, সেইখানেই স্বাধীনতা। বিবিধ রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মনীতিতে জাতির উন্নতি হইয়াছে, পক্ষান্তরে ধর্ম্মের অবনতিতে জাতির অধোগতি হইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজের উত্থান-পতন ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ স্থল। যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মের একতা না হইবে, সে পর্য্যন্ত আর মনে মন মিলিবে না; সে পর্য্যন্তই অনাত্মীয়তার জাল দেশময় পরিব্যাপ্ত থাকিবে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই।

তৃতীয়তঃ। বিজাতীয় অনুকরণে আসক্তি। ৪র্থতঃ। দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি অমনোযোগ। আমরা এই দুইটী বিষয় একত্র করিয়া লইলাম। আমাদিগের বিশ্বাস, যখন বিজাতীয় অনুকরণ-ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হয়, তখনই দেশীয় রীতি নীতির প্রতি ঘৃণা জন্মে। প্রথমটীর বর্ত্তমানে অন্যটীর আদর সম্ভবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডবাসিগণ ভারতবাসিগণের অনুকরণের একমাত্র আদর্শ। দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতিতে আর নব্য সম্প্রদায়ের মনকে হরণ করে না। সকলই পরিবর্ত্তন হইতেছে। পরিধেয় বস্ত্র, আহারীয়

দ্রব্য, পানীয় বস্তু, অন্তরের প্রণয়, স্নেহ, ভক্তি, বিনয়, সরলতা সকলই রূপান্তরিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ভারতবর্ষ এইক্ষণ আর নাই; এইক্ষণ ভারতবর্ষে বৃটিশ জয়পতাকা উড়িতেছে। স্থির মনে যখন বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তখন ভাবি, বৃটিশ-অবলম্বন ব্যতীত ভারত ক্ষমতা-শূন্য, সর্ব্বস্ব-শূন্য। আজ যদি ইংরাজ চলিয়া যায়, তবে নিমেষে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হয়!

আক্ষেপের বিষয় এই, এত সভ্যতার স্রোত বহিতেছে, তত্রাচ কেহই দেশের প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন না। দিন দিনই অনুকরণের ইচ্ছা প্রবল হইতেছে। দেশীয় বস্ত্রের স্থানে মানচেষ্টারের কোটপেণ্টুলনের রাজত্ব!! আমাদের দেশীয় ধূতি চাদরে আর আধুনিক সভ্য সম্প্রদায়ের মান রক্ষা হয় না! দেশীয় শীতল জল পান করিলে আর তৃষ্ণা নিবারিত হয় না! সাক্ষাৎকালীন ঈষৎ শির কম্পন এবং হস্ত চালন ব্যতীত চলে না। আধুনিক ভালবাসা সম্বন্ধে আর কি বলিব। অন্তরে ভালবাসা থাকুক বা না থাকুক, সে বিষয়ে কাহারও মন নাই; বাহ্য আড়ম্বরের কম না হইলেই হইল। মিষ্ট মধুর বাক্য-বিন্যাসে সকল ভালবাসা পর্য্যবসিত। দুঃখ বিপদে কেহ কাহারও সহায় হয় না। বিলাতী সভ্যতায় স্বার্থপরতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে।

মানসিক শক্তি যখন শিক্ষায় প্রস্ফুটিত হয়, তখনই মানব স্বাধীনতা লাভ করে। আমাদিগের রমণীগণ যখন সেই প্রকার স্বাধীন হইবেন, তখন কাহারও অধিকার নাই, তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করেন। সত্য বটে, শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্য্যন্ত পুরুষের সেবা করিতে করিতে আমাদিগের দেশের রমণীগণের স্বাধীন অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইতেছে;—পুরুষের ইচ্ছার সহিতই রমণীর ইচ্ছা মিলিয়া যাইতেছে; কিন্তু যদি এদেশের মঙ্গল হয়, তবে নিশ্চয় এ ভাব তিরোহিত হইবে। ঈশ্বরের সৃষ্টির এই আশ্চর্য্য বস্তুকে যাঁহারা আপন পাশব বলে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, কিম্বা রাখিতে যত্নবান, তাঁহাদিগকে আমরা সমাজের মহা অনিষ্টকারী বলিয়া জানি। পুরুষগণ ঈশ্বরের মধুর সৃষ্টি রমণীর সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়া ভারতের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমরা কখনও ক্ষমা করিতে পারি না। তাঁহাদিগের দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, আমরা আর তাহার প্রশ্রয় দিতে পারি না। স্ত্রীপুরুষের উভয়ের সম-উন্নতি না হইলে কখনও সমাজ

উন্নত হইতে পারে না। রমণীগণের উন্নতির জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে ইঁহাদিগের মানসিক শক্তি ও চরিত্র সম্যক্ বিকশিত হয়, তাহার জন্যই অগ্রে চেষ্টা করা উচিত। মানসিক শক্তি চরিত্র গঠিত ও উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত দেখিতে বাসনা করি না; কারণ তাহার বিষময় ফল কল্পনা করিলেও আমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। মন সবল এবং চরিত্র উন্নত না হইলে ইঁহাদিগের আত্মরক্ষার উপায় নাই।

আমাদিগের প্রধান দোষ এই, আমরা ভাল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই মন্দ বিষয় অনুকরণে লিপ্ত থাকি। এ দোষ কিছুতেই দূর হইবে না। গবর্ণমেণ্টও আমাদিগকে বুদ্ধি-বিবেচনা-হীন ভাবিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন, ইচ্ছামত ঘুরাইতেছেন, পদতলে ফেলিয়া মর্দ্দন করিতেছেন; কিন্তু যে পথে আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা ভরসা, সে পথে কণ্টক পুতিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করিলেও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে সমর্থ হই না!! মনের আগুন মনেই জ্বলিতেছে—চিরদিন জ্বলিবে, তবে বৃথা অনুকরণ করিয়া দিন কাটাই কেন? মানব জীবনের উদ্দেশ্য দেশের এবং মানব পরিবারের উপকার সাধন করা। আমরা মানব, দেশের উপকারের জন্য দেহ-ধারণ করিয়াছি। অতএব বৃথা বিলাসিতার অনুকরণ না করিয়া যাহাতে স্বদেশের উপকার করিতে পারি, কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারি, তজ্জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দুঃখ আছে—সুখ নাই; কষ্ট আছে—শান্তি নাই; অনুভূতি আছে—স্মৃতি নাই,—থাকিলে "সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সব খর্ব্ব হলো ক্রমে" এইরূপ সঙ্গীত শ্রবণেও মন সতেজ হয় না কেন? *

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পাশব বল, স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া, বল সামর্থ্য-হীনা, সহস্র সহস্র মূক অবলার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া স্ত্রীকুলের বুদ্ধি এবং প্রতিভা যদি মলিন করিয়া না রাখিত, তবে, ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে রমণীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, এই উত্তপ্ত সংসারে, একমাত্র শান্তির আধার

---

* এ প্রবন্ধে গ্রন্থকারের পূর্ব্বের মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বলিয়া প্রতীয়মান হইত। চিরকাল এ সংসারে দেখিতে পাই, রমণীর প্রতি পুরুষের কঠোর শাসন, চিরকাল আমরা দেখিতে পাই, রমণীর প্রতি স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বল পুরুষের পশুর ন্যায় ব্যবহার! অনুন্নত বঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী আমরা,—এ কথার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আর আমাদিগকে বিদেশীয় সমাজের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে হইবে না। রমণীর প্রতি পুরুষের এই প্রকার ব্যবহার, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই কোন না কোন সময়ে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? ইহার এক মাত্র কারণ,—পুরুষের শারীরিক বল রমণীগণের শারীরিক বল অপেক্ষা অধিক। এই পাশব-বলের আদর যতদিন থাকে, তত দিনই এই প্রকার ভাব সমাজে প্রচলিত থাকে। পৃথিবীর উন্নতির প্রথম সোপানে এই পাশব বলের রাজত্ব,—এই পাশব বলের আদর। 'জোর যার মুল্লুক তার' এ কথার আদর উন্নতির প্রথম অবস্থার লোকেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বলের অধিকারী মানবই বীর বলিয়া পৃথিবীতে তত দিন অভিহিত, যত দিন না জ্ঞানের আলো মানবের মনকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয়। পাশব বলের পর, জ্ঞানের রাজত্ব। যখন লোকমণ্ডলী এই জ্ঞানের আদর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহারা বলে,—কেবল পাশব বলে পৃথিবীর কার্য্য চলিতে পারে না,—জ্ঞানবল চাই। এই জ্ঞান অনুসন্ধানে যত দিন তাহারা নিযুক্ত থাকে, ততদিন তাহাদিগের মন কঠোর থাকে, এবং তত দিনও তাহারা রমণীর আদর বুঝিতে পারে না। এও উন্নতির চরম অবস্থা নহে। জ্ঞানের পর প্রেমের রাজ্য—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই উন্নতির চরম সোপান। এই প্রেমের রাজ্যে পৌঁছিয়া সকলেই পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ হন্, সকলেই সকলের নিকট বাঁধা পড়েন, আত্ম-বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই বিশ্ব-বিস্তৃত ভালবাসার রাজ্যই একতার রাজ্য; ইহাই মানবের প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণের পথ। এস্থানে আসিয়া পুরুষ ভালবাসায় রমণীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এস্থানে পুরুষের হৃদয়ের ভাব, রমণীর হৃদয়ের ভালবাসার নিকট জ্যোতিঃবিহীন বলিয়া বোধ হয়। এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া পুরুষ আর রমণীর প্রতি পশুভাবে ব্যবহার করিতে পারে না। এখানে আর রমণীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আপনি প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছান্বিত হয় না। বাস্তবিক এই পৃথিবীতে যত কাল পাশব বলের আদর, ততকাল রমণীর প্রতি অত্যাচার;—ততকাল রমণীর স্বাধীনতা অপহরণের ইচ্ছা। পাশব বল যখন মানবকে উত্তেজিত করিতে থাকে, তখন তাহার

হিতাহিত জ্ঞান থাকে না,—মঙ্গলামঙ্গল ধারণাশক্তি বিলোপ প্রাপ্ত হয়। এই পাশব বলের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মানব যত কার্য্য সম্পন্ন করে, এক দিন প্রকৃত প্রস্তাবে সে জন্য তাহাকে আক্ষেপ করিতে হয়। এই পাশব বলের দ্বারা উত্তেজিত হইলে মানবেরা বলে,—"রমণীর আবার স্বাধীনতা কি?" এ অতি আশ্চর্য্য কথাই বটে। এ কথা পূর্ব্বে অসভ্য ইংলণ্ডবাসীরাও বলিয়া সুখ পাইত; কিন্তু আজ আর তাহাদের সে ভাব নাই। আজ পৃথিবীর মধ্যে সুসভ্য ইংরাজ রমণীর আদর করিতে শিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে রমণীর গৌরব ও সম্মানই ইংলণ্ডের বিশেষত্ব। কেবল যে, ইংলণ্ডের দুর্জ্জয় পাশব বলের সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে;—জ্ঞানের কঠোর ভাবের উপরে, হৃদয়-রাজত্ব স্থাপিত হইতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, "পুরুষ আবার স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদান করিতে কে? ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ উভয়কে স্বাধীন করিয়া সৃজন করিয়াছেন,—এরূপ স্থলে পুরুষ স্বাধীনতা প্রদান করিতে কে?" স্বেচ্ছাচারী পুরুষ যদি স্ত্রীর স্বাধীনতা অপহরণ না করিত, তাহা হইলে আমরাও বলিতাম, পুরুষ স্বাধীনতা প্রদান করিতে কে? যখন পুরুষ স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া রমণীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে, তখন পুরুষ সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান না করিলে কখনও স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। কল্পনার স্বপ্ন সকল সময়ে কার্য্যকর হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, পুরুষ উদারতার দ্বারা ভূষিত হইয়া, যত দিন না অবলাদিগের অধিকার ও স্বাধীনতা বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবেন, তত দিন তাঁহারা স্বাধীন হইতে পারিবেন না। এ কথা যদি সত্য না হইত, তবে রমণী চিরকাল অবনত-মস্তকে পুরুষের নিদারুণ অত্যাচার সহ্য কবিতেন না। তবে আর তাঁহারা, জীবন ধারণের জন্য, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় তৃষিত নয়নে অন্যের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন না;—তবে আর তাঁহারা, উঠিতে ও বসিতে, এক মাত্র পুরুষের বাহু অবলম্বন করিবার প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন না। পুরুষ যে স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে, পুরুষের উচিত সেই স্বাধীনতা পুনঃ অর্পণ করা। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী পুরুষেরা বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিতে একটুও সঙ্কুচিত হন্ না,—রমণী চিরকাল পুরুষের পদতলে থাকিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে!! সমাজ যত দিন এই প্রকার ঘৃণিত মত পরিপোষণ করিবে, ততদিন কখনও এদেশের মঙ্গল নাই। আমরা যথাক্রমে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব। স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধিগণ বলেন,—

১। স্ত্রীলোকদিগের শরীর দুর্ব্বল, তাহাদিগের দ্বারা স্বাধীনতার অপব্যবহারের আশঙ্কাই অধিক; কারণ শরীরের সহিত তাহাদিগের মনও দুর্ব্বল।

২। তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই,—এরূপ স্থলে তাহাদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

৩। তাহারা এইক্ষণও অজ্ঞানতার অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে। সম্যক্ পরিস্ফুট হইলেও, তাহাদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভা কখনও যে পুরুষের বুদ্ধি বা প্রতিভাকে অতিক্রম করিতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বুদ্ধি, প্রতিভা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অধীনে থাকাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

৪। এদেশে পুরুষগণ এইক্ষণ পর্য্যন্তও স্ত্রী-মর্য্যাদা শিক্ষা করে নাই; এ দেশের পুরুষদিগের কুটিলচক্রে তাহাদিগের সতীত্ব নষ্টের সম্ভাবনা অধিক।

৫। স্ত্রীস্বাধীনতায় বিজাতীয় অনুকরণ ভিন্ন আর উপকার নাই। অলসপ্রকৃতি রমণীর দ্বারা সংসারের কি উপকার হইতে পারে? কেবল সাহেবের অনুকরণ জন্য কে দেশের চির-প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘন করিবে?

৬। আমরা দুর্ব্বল, পরাধীন। যখন আমরা আমাদের মান, সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ নহি, তখন আমাদের অপেক্ষা দুর্ব্বলা, সহায়-হীনা, আমাদের গৃহ-লক্ষ্মীদিগকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করা বাতুলতা মাত্র।

৭। আমাদের অধিকাংশই দরিদ্র, স্বাধীনতা দিতে হইলে টাকা চাই। নচেৎ ছ্যাকড়া গাড়ীতে করিয়া স্ত্রীদিগকে সমাজের বাহির করিলে লাঞ্ছনার এক শেষ।

৮। আমাদিগের দেশে একরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা রহিয়াছে; দৃষ্টান্তস্থলে বলেন, স্ত্রীরা স্বাধীনভাবে তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন;—আপন আপন অলঙ্কারাদি ইচ্ছামত ব্যবহার করেন;—গৃহ কার্য্যাদিতে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তাঁহারা পরাধীনা হইবেন কেন?

৯। কেহ কেহ বলেন, যদি স্ত্রীজাতি স্বাধীনতার অধিকারিণী হইবেন, তবে তাঁহারা এত কাল বিনা চেষ্টায় অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন কেন?

এই সকল আপত্তি আমরা যথাসাধ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ। স্ত্রীলোকদিগের শরীর দুর্ব্বল, তাহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি। বিদেশীয় রাজার শাসন যখন বর্ণভেদে রূপান্তর ধারণ করিয়া থাকে, তখন অন্ততঃ এইস্থলে গুরুতর চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা কি করিলে দূর হইতে পারে? যাঁহারা কখনও স্ত্রী-স্বাধীনতা দিতে

ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদিগের কোন কথার প্রতি-উত্তর দিতে আমরা ইচ্ছা করি না ;—কারণ তাঁহারা জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রধান উপায় যাহা, তাহা অস্বীকার করেন। স্ত্রীলোকের শরীরের দুর্ব্বলতাই মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ নহে। পুরুষের শরীরের বল অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীর দুর্ব্বল হইতে পারে ; কিন্তু মন দুর্ব্বল, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, আমাদিগের দেশের স্ত্রীদিগের সতীত্ব রক্ষা করিবার সময় তাঁহারা যে প্রকার মানসিক বলের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া, স্ত্রীলোকের মন দুর্ব্বল, এ কথা আমরা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। অনেক স্থলে, সামান্য প্রলোভনে পুরুষের মনই বরং বিচলিত হইয়া যায় ; কিন্তু স্ত্রীর মন অটল, সুদৃঢ়। তবে কথা এই যে, সকল স্থলেই যে সকলের মন ঠিক থাকে, তাহা নহে। মানবের মন দুর্ব্বল, ইহাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। সমাজে কঠোর অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, সে প্রকার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এস্থলে আর একটী কথা আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। স্বাধীনতা না থাকিলে প্রকৃত প্রস্তাবে লোকের সবল মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রলোভন হইতে দূরে রাখিলে তাহারা যে ভাল থাকিতে পারে, তাহা ঠিক কথা ; কিন্তু যাঁহারা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া রিপুজয়ে সমর্থ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহাদের মনই সবল। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিলেও মন যে কলুষিত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য, প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহারা বিচলিত হন না, তাঁহারাই ধন্য। সেই প্রকার সবল মন, কখনও সম্মুখ-সমর ব্যতীত, মনুষ্য, উপার্জ্জন করিতে পারে না। হিতাহিত জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তির তাড়নায় মানব যখন কুপথ পরিত্যাগ করে, তখনই তাহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায় ; নচেৎ কারা-বদ্ধ,—প্রলোভন হইতে দূরগত মানবের মন কখনও সবল হইতে পারে না। শরীরের বল সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। শরীর চালনা না করিলে যেমন শরীর সবল হয় না, সেই প্রকার মানসিক শক্তি পরিচালিত না হইলেও মন সবল হয় না। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের শরীর এত যে দুর্ব্বল, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, তাহাদের শরীরের চালনা হয় না। এ সম্বন্ধে শারীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতান্তর নাই। যাঁহারা স্ত্রীলোকের মনের দুর্ব্বলতা স্বীকার করেন, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, উপযুক্ত রূপে পরিচালিত না হইলে কখনও মন সবল হইতে পারে না। অন্যদিকে, অপরিচালিত অবস্থাতেও,

স্ত্রীলোকের যে মানসিক বল আছে, তাহা পুরুষের মানসিক বল অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। বাস্তবিক মহিলাদিগের মানসিক শক্তি সম্যক্ প্রকারে পরিচালিত হইবার বিস্তৃত স্থান পাইলে যে, তাঁহাদের মন আরো সবল হইবে, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। অগ্রে স্বাধীনতা না পাইলে কখনও তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। অধীনতার নিগড়ে মন কখনও স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে না; সুতরাং সম্যক্ বলও হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন,—অগ্রে সাঁতার শিখিব, তারপরে জলে নামিব, তাঁহাদিগের নিকট এ যুক্তি ঠিক যে—অগ্রে স্ত্রীর মন সবল হউক, তারপর স্বাধীনতা দিব !! জলে না নামিলে যেমন সাঁতার শিক্ষা হয় না, সেই প্রকার স্বাধীনতার বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ না করিলে মন স্ফূর্ত্তি পায় না, সুতরাং সবল ও উন্নত হইতে পারে না। তাই বলিয়া আমরা বলি না, যে ব্যক্তি সাঁতার না জানে, তাহাকে অগাধ সলিলে নিক্ষেপ কর!! স্ত্রীলোকের মন উন্নত করিতে হইবে বলিয়া আমরা বলি না যে,—একেবারে তাহাদিগকে বড় বড় সভায় লইয়া যাও। আমরা বলি, যে জলে নামাইলে সাঁতার শিক্ষাও হয়, অথচ লোকের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা নাই, প্রথমতঃ সেই জলে সাঁতার-শিক্ষার্থীকে নামাও। আমরা বলি, যে স্বাধীনতায় স্ত্রীর প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা নাই, অথচ শরীর সবল হইতে পারে, মন উন্নত হইতে পারে, সেই রূপ স্বাধীনতা দেও। আমরা শরীরের বলকে কোন প্রকার গণনায় আনিতে চাহি না। যাঁহার মন সবল, তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইলেও কোন আশঙ্কার বিষয় নাই। আমরা মানসিক বলেরই অধিক পক্ষপাতী। মানসিক বলে যাঁহার মন সতেজ হয়, আত্মা উন্নত হয়, তাঁহার শরীরের বল থাকুক বা না থাকুক, সে লোকের পতন নাই। আবার সকল পুরুষের শরীরের বল সমান নহে, অথচ তাঁহারা সমানভাবে স্বাধীনতার অধিকারী; তবে দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের দ্বারা কেন স্বাধীনতার অপব্যবহার হইবে, আমরা এ আশঙ্কার অর্থ বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ। শিক্ষা ভিন্ন কখনও মানসিক শক্তি বিকশিত হয় না, এবং মন সবল হয় না। এই শিক্ষা সকলেই পাইয়া থাকে, এবং একটু একটু করিয়া সকলের মনই উন্নত হয়। যাহারা ঘোরতর অসভ্য,—তাহারাও ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত হয়। পুস্তক পাঠে শিক্ষার সহায়তা করে, কিন্তু পুস্তক ভিন্নও লোক শিক্ষিত হইয়া থাকে। লোক শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক, এই

জগৎসংসার তাহাকে শিক্ষা দিবেই দিবে। এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমাদিগের দেশের রমণীগণও যে কিছু পরিমাণে শিক্ষিতা, বোধ করি, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু যতদূর হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই। এ কথার কি উত্তর নাই? এ কথার উত্তর এই,—পুরুষদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে, স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য তেমন কিছুই নাই! স্ত্রীশিক্ষার জন্য আমাদিগের দেশে তেমন কোন প্রকার চেষ্টা হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা, আমাদিগের দেশে অপব্যয় মধ্যে পরিগণিত। তাহার কারণ এই,—আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা চাকুরী প্রভৃতি জীবন ধারণের উপায় অবলম্বন করেন না। আমরা বলি, তাতেই বা ক্ষতি কি? স্ত্রীলোকেরা জীবন ধারণের চেষ্টা কবিবেন, তাহাতে কি ক্ষতি? অন্যথা, তাঁহারা এ চেষ্টা না করিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে অনুৎপাদক পরিশ্রমের (অর্থাৎ তাঁহাদের শিক্ষা) জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত মনে করি না। আমরা বলি, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে চাকুরি গ্রহণ বা জীবন ধারণের উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না, তাঁহাদিগের স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতাকে এত নীচভাবে দেখি না। আমরা বলি, স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্বাধীনতা চাই,—সে এই জন্য যে, ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহাদিগের মন উন্নত হইবে, সতেজ হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের অনেক উপকার দর্শিবে। সংসার, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের নিকটেই অনেক প্রত্যাশা করিয়া থাকে। আমরা যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার এত পক্ষপাতী, সে এই জন্য যে,—স্ত্রীলোকের দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে কোন প্রকার দেশের উপকার জনক কাজ হইতেছে না বলিয়া দেশ এত হীনাবস্থাপন্ন রহিয়াছে। আমরা পুরুষদিগের শিক্ষার জন্য যত উপায় দেখিতে পাইয়া থাকি, স্ত্রীলোকদিগের জন্যও সেই প্রকার উপায় দেখিতে ইচ্ছা করি। কেবল কি তাহাই? না—আরও কিছু চাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, দেখিতে গেলে,—প্রকৃত শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাশাপাশি থাকে। শিক্ষা ও স্বাধীনতা অভিন্ন; ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, এ দুইটীর সূত্র অগ্রে দেওয়া উচিত।

১। "যে প্রণালীর শিক্ষার দ্বারা মনের প্রত্যেক শক্তি বিকশিত হয় এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে রত হয়, তাহাকেই আমরা যথার্থ শিক্ষা বলি।"

২। "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জ্ঞান এবং বিশ্বাস মতে যে অবস্থায় কার্য্য করিতে পারে, আমরা সেই অবস্থাকেই স্বাধীনতা বলি।"

এইরূপ স্বাধীনতা ব্যতীত শিক্ষার অস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ, যাঁহাদিগের দ্বারা কোন জাতির স্বাধীনতা-রত্ন অপহৃত হয়, তাঁহারা তাহার পুনরুদ্ধারের পথে এত কণ্টক রাখিয়া যান যে, কাহার সাধ্য সে পথে বিচরণ করেন। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যথার্থ শিক্ষায় মন যতদূর স্বাধীন এবং স্বানুবর্ত্তী হয়, ততদূর আর কিছু দ্বারাই হইতে পারে না। কারণ, কেহই তাহার নিজকে না জানিয়া প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে পারে না। মনুষ্য নিজকে জানিলেই স্বাধিকার এবং সাধারণ সম্বন্ধের বিষয় জানিলেন। এখন বলুন দেখি, কোন্ নীচাশয় নিজকে চিনিয়াও পরের পদে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত না হয়? তবেই দেখা গেল যে, শিক্ষা, স্বাধীনতা পরিবর্দ্ধক ও উদ্দীপক।*

প্রকৃত শিক্ষা যাহা, তাহা স্বাধীনতা ব্যতীত হইতে পারে না, এবং স্বাধীনতার অস্তিত্বও শিক্ষা ব্যতীত অসম্ভব। অনেকে বলিবেন, আমাদিগের দেশ পরাধীন, কিন্তু এদেশেওত শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। একথার উত্তরে আমরা বলি,—এদেশে এখনও প্রকৃত শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই। এদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইলে, এদেশ এত হীনাবস্থাপন্ন থাকিত না। যাঁহারা স্ত্রীলোকের শিক্ষা হয় নাই বলিয়া, ইঁহাদিগের স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না।† দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের পুরুষগণও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত নহে, তাহাদিগের স্বাধীনতা যখন মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছে, তখন স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কেন মঙ্গলকর না হইবে? ঈশ্বরের সৃষ্টির এই দুই বিভাগের মধ্যে আমরা আকৃতিগত বিভিন্নতা ভিন্ন আর কোন প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাই না। পুরুষ স্বাধীন, স্ত্রী পরাধীন; ইহাতে সমাজের এক বিভাগকে শিক্ষার অনধিকারিণী করিয়া আমাদিগের দেশের পুরুষগণ দেশের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। বাস্তবিক স্ত্রীজাতি প্রকৃত রূপে শিক্ষিতা হইলে, ইঁহাদিগের দ্বারা যে সমাজের অশেষ প্রকার মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই শিক্ষার দ্বার ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট অবরুদ্ধ থাকিবে, যতদিন না তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

---

* ১২৮৩ সালের ভারত সুহৃদ্ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা।

† ভারত সুহৃদ্ পত্রিকা—অভিন্নত্রয়।

তৃতীয়তঃ। স্ত্রীলোকেরা এইক্ষণও অজ্ঞান অন্ধকারে বিচরণ করিতেছেন,— সে কেবল পুরুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি বা প্রতিভা পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রতিভা হইতে হীন, ইহা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা এ কথার কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভা পরিচালনের স্থান নাই বলিয়াই, আমরা তাঁহাদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাই না। ঈশ্বর সম উপকরণে স্ত্রী পুরুষ সৃজন করিয়া পুরুষকে মস্তিষ্কের অধিকারী করিয়াছেন, আর স্ত্রীকে মস্তিষ্ক-শূন্য করিয়াছেন, আমরা একথা কখনও বিশ্বাস করি না। বস্তুতঃ যেখানে আমরা স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার উপায় দেখিতে পাই, সেই স্থানেই স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি। আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার তাদৃশ সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, এদেশে এমন সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কথা মনে হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির অলৌকিক পুত্তলিকা। আমেরিকা প্রদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, সে দেশের পুরুষগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, স্ত্রীজাতির বুদ্ধি বা প্রতিভা কখনও পুরুষের বুদ্ধি বা প্রতিভা হইতে হীন নহে। ইংলণ্ডে যে সকল মহিলা শিক্ষায় এবং চরিত্রে পুরুষকে হারাইয়া পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব, স্ত্রীজাতির বুদ্ধি বা প্রতিভা পুরুষ অপেক্ষা হীন নহে। আমাদিগের প্রদেশে স্ত্রীজাতির বুদ্ধি চালনার সে প্রকার সুবিধা নাই বলিয়াই, আমরা স্ত্রীজাতির বুদ্ধি বা প্রতিভার পরিচয় পাই না। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভার পরিচয় পাই না বলিয়াই, আমরা তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে চাই। যদি তাঁহাদিগের বুদ্ধি পুরুষের ন্যায় সমভাবে আজ পরিচালিত হইতে পারিত, তবে, আমরা যেরূপ তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আজ তাহা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারাও সেই প্রকার আমাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আজ তাহা পুনঃ প্রদান করিতেন না। স্ত্রীজাতির শারীরিক ও মানসিক বল, বুদ্ধি এবং প্রতিভা সকলই আমরা মলিন ও প্রভাহীন করিয়া রাখিয়াছি; এবং রাখিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়াই আজ তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছি; নচেৎ আমরা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে অমনি তাঁহারাও আমাদিগের বিরুদ্ধে কথা বলিত; আমরা বলে বা কৌশলে স্ত্রী-স্বাধীনতা অপহরণ করিলে, তাহারও বলে বা কৌশলে

পুরুষ-স্বাধীনতা অপহরণ করিত! বাস্তবিক আমরাই তাঁহাদিগের সকল পথ বন্ধ করিয়াছি।

আর একটী কথা, মানিলাম আমাদিগের দেশের মহিলারা এইক্ষণও পুরুষের ন্যায় জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বলত, আমরা ইংরাজের সমতুল্য অধিকার লাভ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টর নিকট সিবিলসর্ভিস প্রশ্ন লইয়া যে এত আন্দোলন করিতেছি, আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে কি ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছি? যাঁহাদিগের জ্ঞান আজ পৃথিবীর সকল জাতির উপরে বিজয় ধ্বজা তুলিয়াছে,—যাঁহাদিগের দেশের বিজ্ঞানের ভেরী আজ আকাশ ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে,—রাজনীতির কৌশল পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে সশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা কি তাঁহাদিগের সহিত জ্ঞানে সমতুল্য হইতে পারি? আমরা জ্ঞান গরিমায় তাঁহাদিগের সমান না হইয়াও তাঁহাদিগের ন্যায় রাজ্যের উচ্চ কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য, উচ্চ অধিকার লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। যদি কেহ বলেন যে, তোমরা জ্ঞানে হীন, সুতরাং ইংরাজের ন্যায় উচ্চ কার্য্য পাইবে না, তবে কি তাঁহাদিগকে আমরা বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করি না? কোন কোন পত্রিকা এ প্রকার কথা বলিতেছেন বলিয়া কি আমরা সেই সেই পত্রিকাকে পক্ষপাতী বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি? বাস্তবিক ইংরাজ উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী, তাহা জানি; কিন্তু যে কার্য্য আমাদের দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে, সে কার্য্যে অত জ্ঞানের ছলনা কি নিমিত্ত? হিতৈষি! আপনার প্রতি নিরীক্ষণ কর; ইংরাজের সহিত তুলনা করিয়া আমরা যে প্রকার অজ্ঞানী; আমাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রী-সমাজ সেই প্রকার জ্ঞানহীন। কিন্তু তাহাতে কি? যেখানে অল্প জ্ঞানে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, যেখানে উচ্চ জ্ঞান দিয়া কি হইবে? আমারা যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট ইংরাজের সমতুল্য অধিকার লাভ করিবার জন্য আবেদন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতিও আমাদিগের নিকট সমান অধিকার লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন। মানুষের অধিকার সমান। তাহারা অনুদার--স্বেচ্ছাচারী,—বা পক্ষপাতী, যাহারা জ্ঞানের ছলনায় স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পদানত রাখিতে ইচ্ছুক। আমরা যেমন গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছি,—আমরা উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হই নাই, তাতে কি, কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পরীক্ষা কর, দেখ আমরা কার্য্য করিতে পারি কি না; আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতিও সেইরূপ বলিতে পারেন,--আমরা অজ্ঞানতা-

অন্ধকারে রহিয়াছি, তাতে কি,—স্বাধীনতা দেও, পরীক্ষা করিয়া দেখ,—আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে কি না।” একথার প্রতিবাদ আমরা করিতে অক্ষম। যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী, তাঁহারা একথার উত্তর দিন্, আমরা শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চতুর্থতঃ।—ভারতের রমণীকুলের সতীত্ব জগতে প্রসিদ্ধ; অন্যান্য দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যত অন্যায় কথা আরোপিত হউক না কেন, ভারতের ললনাগণের প্রতি কখনও আমাদিগের অবিশ্বাস হয় না। আমাদিগের দেশের পুরুষ জাতি এইক্ষণ পর্য্যন্তও স্ত্রীজাতির সম্মান করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের এত অল্প বিশ্বাস নহে যে, পুরুষের কুটিল মন এদেশের স্ত্রীজাতির সতীত্বের নিকট পরাস্ত হইতে পারে না। আমরা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি, এবং যতদিন পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন বলিব,—যে সতীর অস্তিত্বে সংসারের পুরুষ জাতির কুটিল মন পরিবর্ত্তিত না হয়, সে সতীর অস্তিত্বে আবশ্যকতা নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন,—গৃহে আবদ্ধ থাকে বলিয়া এদেশের মহিলাগণ সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্যথা তাঁহাদিগের জীবন ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত। আমরা একথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া যখন লোক আপনাকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হয়, তখন বাহিরে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও, তাঁহার অন্তরে পাপের কালিমা স্পর্শ করিয়া তাহাকে অসার এবং অপদার্থ করিয়া থাকে। সহজ কথায় বলিতে হইলে আমরা এই বলিতে পারি,—প্রলোভন হইতে দূর স্থানে অবস্থান করিয়া যাঁহারা আত্মজয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন,—আড়ম্বর-সর্ব্বস্ব সংসারের লোকেরা তাঁহাদিগের জীবনকে অসার জ্ঞান না করিলেও, অন্তরদর্শী জগদীশ্বরের নিকট তাঁহাদিগের আত্মরক্ষার উপায় নাই। আমাদিগের রমণীগণের মন এত সঙ্কুচিত, এত অসার, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমরা বলি—বলপূর্ব্বক একজনের সতীত্ব রক্ষা করায় কোন বাহাদুরী নাই। এই স্থানে আমাদিগের জনৈক বন্ধুর একটী গল্প মনে পড়িল। “একজন গৃহস্থ রাস্তার পার্শ্বে পরিবার লইয়া বাস করিতেন। সেই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ এক জন পথিক সন্ধ্যার সময় গান করিতে করিতে চলিয়া যাইত। গৃহস্থ প্রত্যহ পথিকের গান শ্রবণ করিয়া চিন্তায় অস্থির হইতেন, ভাবিতেন,—স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করা বোধ করি এ যাত্রা কষ্টকর হইয়া উঠিল। এক দিন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সেই

পথিককে ডাকিয়া বলিলেন,—'দেখ, আমি এ বাড়ীতে পরিবার লইয়া বাস করিতেছি, আর তুমি প্রত্যহ এই স্থান দিয়া গান করিতে করিতে যাও; ইহাতে স্ত্রীলোকের মন সহজেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, সুতরাং তুমি আর এ প্রকার করিও না।' পথিক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমার একটী দুইটী গান শুনিলেই যদি স্ত্রীলোকের মন চঞ্চল হয়,—তাহাদের সতীত্ব নাশের সম্ভাবনা হয়; তবে তাহাদের মন নিতান্ত দুর্ব্বল। এমন করিয়া সতীত্ব না রাখিলেই কি চলে না?' পথিকের কথা শুনিয়া গৃহস্থ নীরব হইলেন।

আমরা জানি, এ সংসারে অনেক লোক আছে, তাহারা আপন স্বভাবের কলঙ্করেখার অনুরূপ রমণীর-জীবন কল্পনা করিয়া স্ত্রীকুলে ঘোরতর কলঙ্করেখা আরোপ করিয়া থাকেন। যাহারা যে প্রকার ধরণের লোক, তাহারা যে সে ভাবে সমস্ত জগৎ সংসারকে গ্রহণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। আমরা এমন অনেক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, যাহারা বলেন এবং সন্দেহ করেন যে, "এসংসারে ভাল লোক নাই, বা থাকিতে পারে না।' যাহাদিগের মন এত নীচ, তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই; তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করি,—স্ত্রীজাতির হৃদয়ের বল ভিন্ন,—জীবনের আদর্শ ভিন্ন, তাহাদিগের সে কুসংস্কারাবৃত মনের সেই দূষিত চিত্র কোন প্রকার তর্ক বা কথায় দূর হইবে না। লোকের মন সকল সময়ে কেবল কথায় পরিবর্ত্তিত হয় না। অনেক সময় দেখিতে পাইয়া থাকি, যেখানে কথা কোন প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না, সেখানে প্রত্যক্ষ ঘটনার দৃষ্টান্তে অনেক কার্য্য এবং সুফল প্রসব করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তে মানব হৃদয়ে যে সুফল অঙ্কিত করে, এমন আর কিছুতেই পারে না। এই প্রকার নীচ প্রবৃত্তির লোকদিগকে সেই প্রকার উচ্চ জীবনের দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কেহই পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না।

আমাদিগের দেশের পুরুষ যে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহা ঠিক কথা। কিন্তু সংসার-বিদ্যালয়ের ঘটনাবলী অধ্যয়ন না করিয়া কে কবে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছে? আমাদের এই কঠোর সংসারে পুরুষ যেমন পুরুষের মর্য্যাদা করিতে পারে, পুরুষ সে প্রকার স্ত্রীর মর্য্যাদা জানে না, ইহার একমাত্র কারণ এই,—স্ত্রীজাতিকে সমাজের অধিকার দেওয়া হয় না। সামাজিক নানাবিধ কাজে উভয় জাতি মিলিত না হইলে, কখনও উভয়ের প্রতি উভয়ের সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে

না। অনেকে বলিয়া থাকেন, সে প্রকার মিলনে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিয়া থাকে। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। যখন কোন ইংরাজ-মহিলা রাস্তা দিয়া চলিয়া যান, তখন তাঁহার প্রতি কাহারও কুটিল নয়নের কুটিল দৃষ্টি-বাণ পতিত হয় না; কিন্তু সেই সময়েই একটী এদেশীয় ভদ্রমহিলাকে রাস্তায় দেখিলে অমনি চতুর্দ্দিকের লোকের কুটিল নয়ন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়! দেশের কি শোচনীয় অবস্থা!! আমরা বলি; যখন এই প্রকার চিত্র আর নূতন বোধ হইবে না, অর্থাৎ যখন পুরুষের ন্যায় দলে দলে এদেশের মহিলাগণ রাস্তায় বাহির হইবেন, তখন আর তাহাদিগের নয়নের এ কুটিল দৃষ্টি থাকিবে না। আমরা স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষজাতি সম্মিলিত না হইলে, উভয়ের প্রতি উভয়ের সম্মান বা মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে না। আমাদিগের দেশের লোক, স্ত্রীজাতির সহিত নানা কাজে, নানা ব্যবহারে সম্মিলিত না হইলে, কখনও, কেবল কল্পনা করিয়া, স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। কল্পনায় যেমন ভীতি জন্মে না, কল্পনায় সেইরূপ সম্মান-বোধও উদয় হয় না। ব্যাঘ্র আসিতেছে, কল্পনা করিয়া কেহই ভীত হয় না, ঘটনা প্রত্যক্ষ হইলে ভয় জন্মে; সেইরূপ, লোকের মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ না করিলে কল্পনায় সম্মান-বোধ জন্মে না।

আর একটী কথা। আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, কেবল বিশ্বাস করি না, পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছি,—আমাদিগের দেশের পুরুষের মন অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মন অধিকতর সবল। যদি এ দেশের নৃশংস পুরুষ-পশু সকলের কুটিল নয়ন-দৃষ্টি ভাল হয়, তবে তাহা রমণী জীবনের উচ্চ আদর্শে হইবে। আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি, যদি এদেশের পাষণ্ডদল কখনও দলিত হয়, তবে তাহা আদর্শ সতীদিগের দ্বারায় হইবে। আমাদিগের দেশে সে প্রকার সতীত্ব চাই না, যাহা কেবল বল পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়। আমাদিগের দেশে রমণীর সে দুর্ব্বল মন চাই না, যাহা প্রলোভন দেখিলেই চঞ্চল হইয়া উঠে। যে পুরুষের মন ফুলের আঘাতে বিলোড়িত হয়, পাপের অগাধ সলিলে আপন অস্তিত্ব ডুবাইয়া, সেই পুরুষ, রমণী জীবনের ইহাপেক্ষা আর অধিক কি শোচনীয় অবস্থা কল্পনা করিবে!! এজন্যই, তাহারা বলে, রমণীর মন দুর্ব্বল। যদি, এদেশে প্রকৃত হৃদয়বান, পবিত্র, পাপের অস্পৃশ্য আত্মজয়ী কোন মানব থাকেন, তবে অবশ্য তিনি স্বীকার করিবেন, এদেশের স্ত্রীর সতীত্ব অতুলনীয়: তাহা সহস্র সহস্র

পুরুষের কুটিল মনকে পরাজিত করিয়া আপনাকে জয়ী রাখিতে পারে। বাস্তবিক, স্ত্রীজাতির সহিত সম্মিলিত না হইলে এদেশের পাষণ্ডকুল কখনও দলিত হইবে না,—এদেশের লোক কখনও স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা শিখিবে না। ঈশ্বর, এদেশের অবলাগণের একমাত্র সহায় হইয়া, তাঁহাদিগের হৃদয়ের বল শত গুণে বর্দ্ধিত করুন।

পঞ্চমতঃ।—স্ত্রী পুরুষ উভয়কে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রচনা বলিয়া জানি। ঈশ্বর সংসারে কোন পদার্থকেই অকর্ম্মণ্য বা উদ্দেশ্য-শূন্য করেন নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জীবনই উদ্দেশ্য-পূর্ণ এবং কর্ম্মশীল। ঈশ্বর এই দুই ভিন্ন প্রকৃতি মিলিত করিয়া পূর্ণ মানবের ছবি জগতে দেখাইয়াছেন। আমরাও, যখন মানবতত্ত্ব অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখন রমণীর মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই, যাহা পুরুষের মধ্যে একেবারেই নাই; আবার অন্যদিকে পুরুষের মধ্যেও এমন কতকগুলি ভাব দেখি, যাহা স্ত্রীর মধ্যে আদৌ পরি-লক্ষিত হয় না, একথা বোধ করি সকলেরইই স্বীকার্য্য। এই সকল যখন তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়কে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, আমরা প্রকৃতির অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই দুই অর্দ্ধ অঙ্গ মিলিয়া যখন পূর্ণাঙ্গ মানবের ছবি সৃজিত করে, তখন সে চিত্র, সে মনোহারিত্ব দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হই, এবং স্রষ্টার অত্যাশ্চর্য্য লীলা-সাগরে ডুবিয়া যাই। স্ত্রী পুরুষ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, সংসারের সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম নহেন; তজ্জন্যই, ঈশ্বর অকাট্য বন্ধনে নরনারীকে সম্বদ্ধ করেন। নিতান্ত অসভ্য-দিগের মধ্যেও এ বন্ধনের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে;—ইহা লোকের সৃজিত বন্ধন নহে; ইহা ঈশ্বর-প্রদত্ত বন্ধন। এই বন্ধনকে আমরা প্রেম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। এই প্রেমের দ্বারা যখন অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী ও অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষকে মিলিত করিয়া, বিধাতা পূর্ণ মানব সৃজন করেন, তখন তাহাকে আমরা বিবাহ বলিয়া থাকি। ঈশ্বর এই উভয়কে তুল্য স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কাহাকেও প্রভু এবং কাহাকেও দাসী করেন নাই। স্ত্রী স্বাধীনতায় বিজাতীয় অনুকরণ হয়, একথা আমরা অলীক, মূল-শূন্য বলিয়া স্বীকার করি;—এ ঈশ্বরের অনুকরণ,—এ ঈশ্বরের প্রদত্ত ধন। মানব যে দস্যুবৃত্তি করে, সে সকল পাপ কার্য্য করে, তাহা কখনও আত্মার স্বাভা-বিক কার্য্য নহে। সেই প্রকার, পুরুষ যে স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা বলপুর্ব্বক স্ত্রী-

স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া থাকে, ইহাও স্বাভাবিক নহে। স্ত্রীজাতিকে আমরাই অলস করিয়া তুলিয়াছি,—আপনারা প্রভু হইয়া, বৈদিক সময়ের ব্রাহ্মণেরা যেরূপ শূদ্রদিগকে সর্ব্বাধিকার বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, স্ত্রীদিগকে অলস, অকর্ম্মণ্য, সকল কার্য্যের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছি। ব্রাহ্মণেরা যেমন শূদ্রদিগের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া দিয়াছিলেন, আমরাও, সেই প্রকার, অবলাদিগের বিদ্যা শিক্ষা অবৈধ বলিয়া দিয়াছি। ব্রাহ্মণেরা যেমন শূদ্রদিগকে সকল কার্য্যেরই অনধিকারী প্রতিপন্ন করিয়া আপনারা প্রভুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমরাও, সেই প্রকার, স্ত্রীদিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনারা প্রভু হইয়াছি!! কাল সহকারে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্তু হায়! এদেশের অবলা-দলনকারী পাষণ্ডদিগের ক্ষমতা অপ্রতিহতই রহিয়াছে!!

আর একটী কথা,—স্ত্রী-স্বাধীনতাকে যাঁহারা সাহেবের অনুকরণ বলিয়া দেশের প্রথা উল্লঙ্ঘন করাকে দোষের বলিয়া থাকেন, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, অনুকরণই মানব জীবনের শিক্ষা-পথের নেতা এবং উন্নতির মূল। নিতান্ত অসহায় অবস্থা হইতে বালক অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়া থাকে। এই অনুকরণ ভিন্ন মানব উন্নতি লাভে অসমর্থ। কিন্তু অনুকরণের আবার সীমা আছে। ভাল মন্দ বিচার করিবার যাহার শক্তি নাই, তাহার অনুকরণ না করাই ভাল; কারণ বল-শূন্য, শক্তি-শূন্য অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তি ভাল বিষয় অনুকরণ করিতে যাইয়া মন্দ বিষয় অনুকরণ করিয়া ফেলে। অনুকরণ করা দোষের নহে, কিন্তু মন্দ বিষয় অনুকরণ করা দোষের। যাঁহারা মন্দটুকু পরিত্যাগ করিয়া ভাল টুকু অনুকরণ করিতে পারেন, এ সংসারে তাঁহারাই ধন্য। স্ত্রী-স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক আমরা অপহরণ করিয়াছি, এইক্ষণ বিদেশীয় অনুকরণেও যদি আমরা ইহা পুনঃ প্রদান করিতে পারি, তাহাতে আমাদের গৌরব ভিন্ন অগৌরব নাই।

ষষ্ঠতঃ। আমরা ক্রমাগত দেখিয়া আসিতেছি, আমেরিকার দাস প্রথার পক্ষপাতিগণ যে সকল আপত্তি করিয়া দাসদিগের স্বাধীনতা প্রদান করিতে অস্বীকার করিতেন, আমাদিগের দেশের পুরুষগণ ঠিক সেই সকল আপত্তি তুলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করেন। চ্যানিং, পারকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তকে ঠিক যেন আমাদিগের দেশীয় স্ত্রী-স্বাধীনতার

বিরোধীদিগের আপত্তিগুলি রহিয়াছে। আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের পক্ষপাতীরা বলিতেন,—দাসেরা দুর্ব্বল, অশিক্ষিত, আজন্ম দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহারা সহায়হীন, তাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহারা কি স্বাধীনতার সংব্যবহার করিতে পারে? আমাদিগের দেশের লোকেরাও বলেন,—"স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল, অসহায়, পরাধীন, চিরকাল গৃহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছে,—ইহারা কি স্বাধীনতার সংব্যবহার করিতে পারে?" পারে ত না-ই; যাঁহারা ইহার প্রস্তাব করেন, তাঁহারা বাতুল।* অবলাকুলের এই প্রকার হিতৈষীদিগকে আমরা বলিতে চাই,—ঈশ্বর অবলাদিগকে যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা অপহরণ করিতে তোমাদের কি অধিকার? ঈশ্বর প্রত্যেক মানবকে অল্পাধিক পরিমাণে বুদ্ধি, প্রতিভা ও বিবেচনা-শক্তি প্রদান করিয়া সৃজন করিয়াছেন; এবং প্রত্যেকের মঙ্গলামঙ্গলের ভার প্রত্যেকের নিজ হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তিনি এক জনকে প্রভু এবং এক জনকে দাস করেন নাই। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, তাহাদের মন সবল, এইরূপ সৃষ্টির নিয়ম। আমরা একদিকে না একদিকে প্রত্যেকের মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়া থাকি। বঙ্গপ্রদেশের পুরুষ আমরা যে আমাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হই না, তাহার এক মাত্র কারণ, আমরা অন্যের বাহু অবলম্বন করিয়া থাকিতে ভালবাসি। অন্যের তোষামোদ করা আমাদিগের জীবনের ভূষণ; ইংরাজদিগের ভালবাসা পাইবার জন্য আমরা এত লালায়িত যে, তাহাদের পদধূলি মস্তকে বহন করিতেও কাতর বা কুণ্ঠিত হই না। বাস্তবিক যাহাদের মনে বল আছে, তাহাদের শরীরে বল না থাকিলেও, মান সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষে কষ্ট নাই। মানসিক বল এবং হৃদয়ের বলকে আমরা পাশব বল হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করি। এই প্রকার মানসিক বল এবং হৃদয়ের বলের নিকট পৃথিবী মস্তক অবনত করিয়া থাকে। একথা যদি সত্য না হয়, তবে এজগতে আর কিছু সত্য আছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। অবলাজাতির হৃদয়ের বল অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং মনের বলও শিক্ষা ও জ্ঞান উপার্জ্জনে বর্দ্ধিত হইতে পারে। তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে কেন? তাঁহাদিগের মান, মর্য্যাদা তাঁহারা আপনারাই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

সপ্তমতঃ। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, আমরা দরিদ্র,

---

* ১২৮৬ সালের ২৩ শে ভাদ্রের সাধারণী (প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

সুতরাং আমাদিগের স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে।* স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা হয় না, ধর্ম্ম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। স্বাধীনতা যদি অবলাকুলের উপকারজনক পদার্থ হয়, তবে দরিদ্রতার ছলনায় সেই কল্যানের পথে বিচরণ করিতে না দেওয়া কোন্ প্রকার যুক্তি শাস্ত্রের তর্ক, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাঁহারা ধনীদিগকে এবং নির্ধনদিগকে ঈশ্বরের সৃষ্টির দুই ভিন্ন বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে আমরা বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করি বা না করি, সে এক কথা; কিন্তু তাঁহারা যে কখনও নীতি ও সত্যের আদর জানেন না, ইহা ঠিক কথা। বিধাতার বিধানে বড় ছোট সব সমান। জল, বায়ু, উত্তাপ, ধনী, দরিদ্র, অবিভেদে সকলের জন্য সৃষ্ট। সেইরূপ, ধর্ম্ম, পুণ্য, প্রেম, জ্ঞানও সকলের জন্য। ধর্ম্মনীতি যেমন ধনী ও নির্ধন উভয়ের সঞ্চয়ের ধন, সেই প্রকার স্বাধীনতাও যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কল্যাণকর হয়, তবে ইহাও ধনী ও নির্ধনের হৃদয়ের ভূষণ। স্বাধীনতাকে যাঁহারা অর্থের সহায়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার আদর করিতে জানেন না। প্রকৃত স্বাধীনতায় গাড়ী চাই না, ঘোড়া চাই না,—দ্বিতল অট্টালিকা চাই না,—কিছুই চাই না। যে মানুষ, যে হৃদয়ের অধিকারী,—মনের অস্তিত্ব যাহাতে আছে;—বিবেচনা শক্তি ও বিবেক যাহার আত্মাকে সজীব রাখিয়াছে,—সে-ই স্বাধীনতার অধিকারী। আমরা বলি, অর্থ থাকুক বা না থাকুক,—স্বাধীন সে, যে আপনাকে আপনি চিনিতে পারিয়া আপনার সম্বন্ধকে সমাজের সহিত মিলাইতে পারিয়াছে। বাস্তবিক যাঁহারা স্বাধীনতাকে কেবল ধনীদিগের সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের ন্যায় নীচ প্রকৃতির লোক এই ভূমণ্ডলে নাই। আমরা বলি, অনেক পুরুষ আছে,—যাহারা দরিদ্র,—অর্থ নাই—টাকা নাই, গাড়ী ঘোড়া নাই, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতা কোন্ বড় লোক অপহরণ করিতে সক্ষম? এই যে দীন দরিদ্র, মলিন-ভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই মলিন কাহিনী লিখিতে বসিয়াছে,—ইহার অর্থ নাই,—তেমন টাকা কড়ি নাই,—গাড়ী ঘোড়া নাই,—কিন্তু সংসারের কোন্ ক্ষমতাশালী লোক ইহার স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারে? প্রকৃত স্বাধীনতা মনে, ইহা বাহিরের বস্তু নহে, ইহা আপন আসনে আপনি সতেজে প্রতিষ্ঠিত; বাহিরের কোন পদার্থ ইহার অবলম্বন নহে। যাহার মন এই দেব-বাঞ্ছিত

* আলবার্ট হল,—প্রতাপ বাবুর বক্তৃতা।

স্বাধীনতায় উজ্জ্বল, কোন প্রকার বাধা বিপত্তি সে মনের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারে না।

অষ্টমতঃ। অনেকে বলিয়া থাকেন, "আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা আছে;—তাহারা ঘরে কেমন বিচরণ করে, কেমন গৃহে কর্তৃত্ব করে, কেমন তীর্থ স্থানে গমন করে, কেমন পুকুরে স্নান করিতে যায়।"* এই যুক্তির কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। আমাদিগের দেশের মহিলাগণের এই প্রকার স্বাধীনতার কথা শুনিলে আমাদের একটী গল্প স্মরণ হয়। একটী গৃহস্থ একটী পাখী পুষিত;—পাখিটী পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিত; কিন্তু পিঞ্জরে থাকিয়াও খাবার খাইত, এদিক ওদিক যাইত ও নানা মধুর বুলি বলিত। গৃহস্থ প্রত্যহ সকলের নিকট বলিতেন;—"দেখত আমার পাখী কেমন স্বাধীন, পাখী কেমন স্বাধীনভাবে আহার করে, পাখী স্বাধীন-ভাবে কেমন পিঞ্জরের এদিক ওদিক যায়, পাখী স্বাধীনভাবে কেমন গান করে।" আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরাও, বুঝি বা, সেই প্রকার স্বাধীন!! তাঁহারা কেমন আহার করেন! স্বাধীনভাবে কেমন পরিচ্ছদ পরিধান করেন! স্বাধীনভাবে কেমন কথা কহেন!! আমাদিগের দেশের লোকের মন এত নীচ যে, স্ত্রীলোকদিগের গৃহ-পিঞ্জরের বিচরণ প্রভৃতিও স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে!!

নবমতঃ। স্ত্রী-জাতি কখনও অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। ঝান্সির রাণী প্রভৃতি রমণী স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ফ্রান্স স্ত্রী-বীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ;—সে দেশের বহুবীর-মহিলা স্বাধীনতার জন্য বিষম সমরে প্রবেশ করি-তেও কাতর হন নাই। আমেরিকায় রমণীগণ এত স্বাধীনতা-প্রিয় যে, আর তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার কাহারও শক্তি নাই। বঙ্গবাসী পুরুষগণ শত শত বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিয়াও, যে কারণে স্বাধীনতা পাইবার জন্য চেষ্টা করে নাই, সেই কারণের আধিক্য হেতু এদেশের রমণীগণ অধীন-তার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছে না, কিম্বা করে নাই। আমাদিগের দেশের পুরুষগণের স্বাধীনতা নাই, এবং সে স্বাধীনতা পুনঃ লাভের জন্য চেষ্টা করে না বলিয়া কি তাহারা স্বাধীনতার অনধিকারী? আমাদিগের দেশের রমণীগণ তবে কেন অনধিকারিণী হইবেন? দাসেরা, স্বাধীনতার আস্বাদন বুঝিত না

* সাধারণী, ১৬ই ভাদ্র, ১২৮৬।

বলিয়া তাহারা তৎবিরুদ্ধে চেষ্টা করে নাই ; কিন্তু এইক্ষণ কি তাহারা স্বাধীনতা পাইয়া তাহার সুখভোগে বঞ্চিত হইতেছে? নীতিবাদিগণের এ যুক্তি যুক্তিই নয় যে, স্ত্রীলোকেরা এতকাল স্বাধীনতা পাইবার জন্য চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, তাঁহারা স্বাধীনতার অনধিকারিণী !

বাস্তবিক দেখিতে গেলে, স্ত্রী-স্বাধীনতা অপহরণ করিবার আমাদিগের কোন অধিকার বা যুক্তি নাই। ঈশ্বর-প্রদত্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া একদিকে আমরা অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য করিয়াছি, অন্য দিকে, আমরা, পাশব বলের পরিচালনার জন্য, এই যুক্তি-বিরুদ্ধ স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার উদাহরণ দেখাইয়াছি। যাহা করিয়াছি, সে জন্য অনুতাপ করা ভিন্ন আর কোন প্রত্যন্তর নাই ; ভবিষ্যতে আর আমরা যাহাতে স্বাধীনতা অপহরণ না করি, তজ্জন্য প্রত্যেকের কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। আমরা যখন স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছি, তখন আমরা স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান না করিলে আর তাঁহারা স্বাধীনতা পাইতে পারেন না। এক্ষণ তাঁহাদিগের অপহৃত স্বাধীনতা প্রদান করা আমাদিগের একান্ত উচিত। যদি তাহা না করি, তবে নিশ্চয়, কালক্রমে যখন তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, তখন আর তাঁহারা আমাদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবেন না। কিন্তু স্বাধীনতা প্রদান করিব কি কেবল বিলাসের সেবা করিতে? কেবল আলাপ পরিচয়, সামাজিক সম্মিলন, বিলাসের সেবা, সভায় গমন, পথে বিচরণ প্রভৃতিতে স্বাধীনতা দিবার সময়ে আমাদিগের একটী বিষয় চিন্তা করা উচিত। সকল প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিলেও, যদি স্ত্রীজাতি আপন আপন জীবন ধারণের উপায় সংস্থান করিতে না পারেন, তবে নিশ্চয় তাঁহাদিগকে পুরুষের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। স্ত্রীজাতি জীবন ধারণ বিষয়ে পুরুষের মুখ চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হন বলিয়া, তাঁহাদিগের জীবন এত পরাধীন। বাস্তবিক কোন প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিবার পূর্ব্বে, স্বাধীন ভাবে তাঁহাদিগের জীবন ধারণের পথ পরিষ্কার করা বিধেয়। নচেৎ কেবল বিলাসের জন্য স্বাধীনতা, সামাজিক সম্মিলনের জন্য স্বাধীনতা, ইহা আমরা চাহি না। স্ত্রী-স্বাধীনতা না থাকাতে সংসারের অনেক প্রকার অপকার হইতেছে, সে এই জন্য যে,—মানব জাতির এক শ্রেণীর পরিশ্রম কেবল অন্য শ্রেণীর জীবন-ধারণে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে ;—তাঁহাদিগের জীবন দ্বারা সংসারের উৎপাদক পরিশ্রম বিভাগের কোন

প্রকার উপকার দর্শিতেছে না। অনুৎপাদক পরিশ্রমের জন্য মূলধন ব্যয় করা যে প্রকার অনুচিত, সেই প্রকার, এক শ্রেণীকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিবার জন্য অন্যশ্রেণীর পরিশ্রম ব্যয়িত হওয়া অনুচিত। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, সংসারের প্রত্যেক বিষয়ের জন্য উভয়েই দায়ী। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ পবিত্র পদার্থ, সেরূপ আর কিছুই নহে। আমাদিগের দেশের প্রধান অভাব এই,—পুরুষজাতি কর্ম্ম করে, স্ত্রীজাতি আলস্যপরায়ণা হইয়া বাস করে; পুরুষও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, আপন ক্ষমতায় তাহাদিগকে পদতলে রাখিয়া কৃতার্থ হয়। আমাদিগের দেশের যে সকল মহিলাগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহারা পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার লাভ করিয়া সকল বিভাগকে উজ্জ্বল করুন, আপন আপন জীবন ধারণের সংস্থানে চেষ্টিত হউন, জ্ঞান বুদ্ধিতে পুরুষকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে, দেশের মহৎ অভাব দূর হইবে; স্বেচ্ছাচারী পুরুষের ক্ষমতা হতবল হইবে, এবং রমণীকুল ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা লাভের উৎকৃষ্ট পথ পাইয়া সেই পথেই অগ্রসর হইবেন। যাঁহারা এইক্ষণ পথ-প্রদর্শিকা হইবেন, তাঁহাদিগকে অনেক বিষয় ভাবিতে হইবে। অনেক দিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। দেশ, তাঁহাদিগের নিকট পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে; তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলে, দেশের ভাবী মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হইবে। আর দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহাদের পদ যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে স্খলিত হয়, এদেশের স্ত্রী-কুলের ইতিহাস ঘোরতর কালিমা দ্বারা অঙ্কিত হইবে। অধিকার লাভ করা সহজ কথা,—কিন্তু সেই অধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার অত্যন্ত কঠিন। যে সকল মহিলা এইক্ষণ প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইবার পথে দণ্ডায়মান হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই বলিতে চাই,—দেশের প্রধান অভাব তাঁহাদিগের দ্বারা দূর হইবে, এই আশা করিয়া, আমরা তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার পথ প্রদর্শন করিতেছি; নির্ভয় অন্তরে, একমাত্র ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হউন;—বিবেকের ধ্বনি ভিন্ন আর কাহারও স্বর কর্ণে প্রবেশ করিতে দিবেন না; বিবেচনা শক্তি ভিন্ন আর কাহারও পরামর্শ শুনিবেন না। শিক্ষা ও জ্ঞান উপার্জ্জন এ পথের সহায়,—দেশের উপকার এ পথের কাজ এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তি একমাত্র লক্ষ্য। এই গুরুতর ব্রত সর্ব্বদা স্মৃতিতে আবদ্ধ করিয়া অগ্রসর হউন;—ভবিষ্যতে উন্নতি বই অবনতি হইবে না।

সমাপ্ত।